প্রকাশঃ ১৯৬০

প্রকাশক
বি. রায়
দেশকাল
৪ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

অলংকরণ ও মুদ্রণে
কোলাজ
২ জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৩

সূচীপত্র

বিশ শতকের ফরাসি কবিতা : আটজন কবি

অনুবাদ : অরুণ মিত্র, লোকনাথ ভট্টাচার্য, নন্দদুলাল দে, সুদেষ্ণা চক্রবর্তী-পাসনবিশ, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, স্বপন দাসমহাপাত্র, সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, আশিস রায়চৌধুরী, মঞ্জুল দাশগুপ্ত, গোলক গুঁই, কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, পুষ্কর দাশগুপ্ত।

অলংকরণ : শান্তু লাহিড়ী।

প্রচ্ছদ : আপোলিনের-এর কালিগ্রাম Pablo Picasso

মুখবন্ধ

বিশ শতকের ফরাসি কবিতা

আজ আমরা যাকে 'আধুনিক কবিতা' বলে অভিহিত করি, তার ইতিহাস রচনা করতে গেলে একশ বছরেরও বেশি পেছনে ফিরে তাকাতে হয়। ফরাসি কবিতায় এই আধুনিকতার পূর্বাভাস সূচিত হয়েছিল জেরার দ নের্ভাল এবং আলোয়াইজ্যুস বের্ত্রঁ-র লেখায়। আর ১৮৫৭ সালে শার্ল বোদলের-এর 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর প্রকাশকে আধুনিক কবিতার জন্মলগ্ন বলে নির্দেশ করা যায়।

উনিশ শতকের ফরাসি সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রতীকিবাদ। কিন্তু প্রতীকিবাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন প্রবণতার বৈচিত্র্য। ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয় মোরেআ-র প্রতীকিবাদী ঘোষণাপত্র। কিন্তু প্রতীকিবাদী বলে চিহ্নিত সমস্ত কবিদের কাছে এই ঘোষণাপত্র কাব্যতত্ত্বের আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল বলে মনে হয় না। নিতান্ত সাধারণভাবে ভাগ করলেও দেখা যায়, এই কবিগোষ্ঠীর একদলের মধ্যে রয়েছে অবক্ষয়, বক্রোক্তি এবং আক্রমণাত্মক ভঙ্গির সঙ্গে একধরনের গীতিময় রোমান্টিকতার রেশ। আরেক-দলের মনোভাবের সঙ্গে পার্নাসিয়াঁদের সহমর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। তবে এঁদের সবারই স্বীকৃত গুরু ছিলেন বোদলের, র‍্যাঁবো, ভের্লেন এবং মালার্মে। এবং এই সূত্র থেকেই এসেছে তাঁদের যাকিছু সহধর্মিতা।

উনিশ শতকীয় প্রতীকিবাদ বিবর্তিত পরিণতি লাভ করে বিশ শতকের প্রথম প্রজন্মের কয়েকজন কবির সৃষ্টিতে—পল ভালেরির স্পষ্ট মনন ও উপলব্ধির সমন্বয়ে রচিত কাব্যিক বিশ্বে—'শুদ্ধ কবিতা'র আদর্শে, পল ক্লোদেল-এর গীতিময় গদ্যে উচ্চারিত মরমী কবিতায়, ফ্রঁসিস জাম-এর সরল, মুগ্ধ কণ্ঠে। মিলোজ-এর রহস্যময় মরমী কাব্যকে বা স্যাঁ-জন পের্স-এর দুরূহ মহাকাব্যিক উচ্চারণকে আমরা প্রতীকিবাদের সীমান্তে স্থাপন করতে পারি। প্রতীকিবাদের ধারা আজ পর্যন্ত বয়ে চলেছে। এই ঐতিহ্যকে বয়ে নিয়ে চলেছেন বেশ কয়েকজন প্রবীণ এবং তরুণ কবি। প্রবীণদের মধ্যে পিয়ের জঁ-জুভ, পিয়ের এমানুয়েল, পাত্রিস দ লা তুর দ্যু পাঁ বা জঁ ক্লোদ রনার-এর ধর্মানুভূতিময় মরমীয়া কবিতায়—জোএ বস্কে বা ইভ বনফোয়ার উপলব্ধির জগতে অন্বেষণে প্রতীকিবাদের সমৃদ্ধ ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। তরুণ-তরদের অনেকের কবিতায়ও প্রতীকিবাদের উত্তরাধিকার পরিলক্ষিত হয়।

তবে এর পাশাপাশি, কবিতায় প্রথার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার প্রয়াস ও সাফল্য বিশ শতকের ফরাসি কবিতায় আধুনিকতার আরেকটি ধারা তৈরি করেছে। সাধারণভাবে প্রতীকিবাদী কবিতায় বাস্তবতার বাহ্যিক রূপ পেরিয়ে তার আন্তরিক স্বরূপের সন্ধান, প্রাত্যহিকতায় মলিন দৈনন্দিন জীবন থেকে কবিতাকে বিচ্ছিন্ন রাখার একটা প্রবণতা দেখা যায়। তাই উনিশ শতকের শেষেই জীবন-বিচ্ছিন্ন প্রতীকিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়ে গিয়েছিল, শোনা গিয়েছিল 'ঢের হয়েছে, বোদলের আর মালার্মের ভক্ত হয়ে বহুকাল তো কাটল'। বিশ শতকের সুরুতেই জ্যুল রমঁ্যা-র নেতৃত্বে 'য়ুনানিমিস্‌ম্‌' আন্দোলন সুরু হল—যার উদ্দেশ্য হল 'একাত্ম এবং সমবেত জীবনের' উপস্থাপনা।

ইতিমধ্যে আধুনিক জীবন এবং জগৎ সর্বব্যাপ্ত, অনস্বীকার্য এবং নানা দিক থেকে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে থাকল। চলচ্চিত্র, গ্রামোফোন, আইফেল টাওয়ার, প্যারিসের ভূগর্ভ রেল, মোটর গাড়ি ইত্যাদি আরো কত কি জীবনে নতুন বিস্ময় আর সম্ভাবনা নিয়ে আসছিল। বাইরের এই নতুন জগত অনতি বিলম্বে কবিতায় প্রবেশাধিকার পেল। ১৯০৯ সালে ফরাসি পত্রিকা ফিগারো-তে বেরুলো ইতালীয়ান কবি মারিনেত্তির 'ভবিষ্যদ্‌বাদী ঘোষণাপত্র'। এই ঘোষণায় যন্ত্রযুগের উপযুক্ত নতুন শিল্পসৃষ্টির আহ্বান জানানো হোল। মারিনেত্তির এই ঘোষণাপত্র ফরাসি কবিদেরও নতুন যুগের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন করে তুলল। ১৯০৬ সালে আপলিনের ভবিষ্যদ্‌বাদের সমর্থনে এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে চিত্রকলায় 'কুবিস্‌ম্‌'ও বস্তুকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার পথ দেখাল।

কবিতায় প্রথামুক্তির সন্ধানী কবিরা আধুনিক জগৎকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে চাইলেন, আধুনিক জগতের প্রশস্তি রচনা সুরু হোল।

১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে ব্লেজ সঁদ্রার লিখলেন 'ন্যু ইয়র্কে ইস্টার'। সেপ্টেম্বরে গীয়োম আপলিনের বন্ধুদের পড়ে শোনালেন 'চিৎকার' নামে কবিতা। 'চিৎকার' কবিতাটি 'জোন' এই পরিবর্তিত শিরোনাম নিয়ে ১৯১৩ সালে প্রকাশিত আপলিনের-এর 'সুরাসার' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা হিসেবে স্থান পেল। আধুনিক শহর—নিউ ইয়র্ক কি প্যারিস—তার জটিলতা, ভীড়, কর্মচাঞ্চল্য, অসংগতি সব কিছু নিয়ে সঁদ্রার এবং আপলিনের-এর কবিতায় দেখা দিল। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয় সঁদ্রার-এর 'ট্রান্স-সাইবেরিয়ানের গদ্য' নামক কবিতা। বোদলের অথবা র‍্যাঁবোর কল্পিত ভ্রমণের পরিবর্তে বাস্তব

ভ্রমণের বিবরণে এখানে কবিতা রচিত হয়েছে। সঁদ্রার এবং আপলিনের-এর কবিতায় বাইরের জীবনের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা, ট্রেনে কি জাহাজে যাত্রা, সহরের বৈচিত্র্যময় পথে পথে হাঁটা, আইফেল টাওয়ার, ট্র্যাম-বাস, সৈনিক-জীবন প্রভৃতি সবকিছুই কবিতার বিষয় হয়ে উঠল।

বিশ শতকে ফরাসি কবিতার প্রথামুক্ত ধারার প্রবর্তক আপলিনের এবং সঁদ্রার। এর সঙ্গে তৃতীয় যাঁর নাম যোগ করা যায় তিনি মাক্স জাকব। ১৯১৭ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে তাঁর দুটি কবিতার বই প্রকাশিত হলে জাকব নতুন কবিতার প্রথম সারির উদ্ভাবক হিসেবে গণ্য হন। তাঁর কবিতার প্রকাশ-পদ্ধতি পরবর্তী স্যুররেআলিস্ত রচনা রীতির সূচনা ঘোষণা করে।

আপলিনের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক হিসাবে যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে কবিতায় স্থান দেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ছিল অনেকটা কৌতূহলী এবং বিস্মিত বালকের। কিন্তু ঐ একই সময়ে যুদ্ধের ধ্বংসের পরিবেশে, শিল্প-সাহিত্যে ভাঙার আন্দোলন 'দাদা'-র সূচনা হয়। নতুনের সমর্থক আপলিনের অবশ্য 'দাদা' আন্দোলন-কেও উৎসাহ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানুষের আশা, চিন্তা ও মূল্যবোধের জগতে যে আঘাত নিয়ে আসে সেই হতাশ মরীয়া অবস্থা থেকেই যেন 'দাদা'-র বিদ্রোহ, সব কিছুকে অস্বীকার করার প্রবণতা। 'দাদা' আন্দোলন ছিল প্রধানত নেতিবাচক, যুক্তির পরম্পরাময় ভাষাসংস্থান তথা চিন্তার বন্ধনকে গুঁড়িয়ে দেওয়াই ছিল 'দাদা'-র প্রয়াস : "মুক্তি : দাদা, দাদা, দাদা, কুঁকড়ে যাওয়া রঙগুলোর আর্তনাদ, বৈপরীত্য আর যতরকমের বিরোধ, বীভৎসতা, অপরিণামের জড়িয়ে যাওয়া : জীবন" (ত্রিস্তঁ জারা, ঘোষণাপত্র ১৯১৮)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে যখন কিছুটা স্থিতি ফিরে এল, তখন 'দাদা'র নাস্ত্যর্থক আন্দোলন একান্তভাবেই অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন হয়ে পড়ল। এই সময়ের 'দাদা'-আন্দোলনের শরিকদের বেশ কয়েকজন বেরিয়ে গিয়ে আঁদ্রে ব্রতোঁ-র নেতৃত্বে স্যুররেআলিস্ত আন্দোলন সুরু করেন। এই আন্দোলনের চরিত্র বিশেষভাবে অস্ত্যর্থক। ১৯২৪ সালের স্যুররেআলিস্ত ঘোষণাপত্রে স্যুররেআলিস্‌ম্‌-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে :

> স্যুররেআলিস্‌ম্‌ : বি. পু., বিশুদ্ধ মানসিক স্বয়ংক্রিয়তা যার দ্বারা প্রকাশ করা যায়, মৌখিক, লিখিত অথবা অন্য যেকোন উপায়ে চিন্তার যথার্থ গতিপ্রকৃতি। যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ বিহীন, কোন প্রকার নৈতিক বা নন্দনতাত্ত্বিক অভিনিবেশের বাইরে, চিন্তার শ্রুতলিপি।

বি পু. = বিশেষ্য পুংলিঙ্গ

স্যুররেআলিস্তরা চাইলেন 'মানসিক স্বয়ংক্রিয়তার জগতে' প্রবিষ্ট হতে; উদ্ভাবিত হোল স্বয়ংক্রিয় রচনা-পদ্ধতি। ইতিমধ্যে বিশের দশকের শেষ দিক থেকে মার্কস্‌বাদ ইয়োরোপময় বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিপ্লবের ধারণা স্যুররেআলিস্তদের আকৃষ্ট করে। ১৯৩০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পটভূমি জটিল হয়ে উঠল। স্যুররেআলিস্তদের সামনে প্রশ্ন দেখা দিল রাজনৈতিক বিশ্বাসের। ব্রঁতো সবরকম 'নিয়ন্ত্রণ'-এর বিরোধিতায় অবিচল রইলেন। ফলে স্যুররেআলিস্ত গোষ্ঠীতে ভাঙন দেখা দিল। প্রথমে লুই আরাগঁ, পরে পল এলুয়ার কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। ১৯৩৬ সালে স্পেনে ফ্রাংকোপন্থী ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে গণতন্ত্রীদের গৃহযুদ্ধ রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে ফ্রান্স তথা ইয়োরোপের বুদ্ধিজীবিদের বিশেষভাবে সচেতন করে তুলল। এই সময়ে এলুয়ার লিখলেন, "সময় এসেছে যখন সমস্ত কবির অধিকার ও কর্তব্য হোল একথা বলার যে, তাঁরা অন্য মানুষের জীবনে, সমষ্টিগত জীবনে গভীরভাবে নিবিষ্ট।" ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরু; ১৯৪০ সালে ফ্রান্স পরাজিত ও জার্মান অধিকৃত হয়। মার্শাল পেতাঁ-র নেতৃত্বে ভিশিতে জার্মান তাঁবেদার ফরাসি সরকার প্রতিষ্ঠিত হোল। প্রতিরোধের আন্দোলনে যোগ দিলেন কবি সাহিত্যিকরা। ব্রতোঁ আমেরিকায় আশ্রয় নিলেন। ফলত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্যুররেআলিস্ত আন্দোলন পিছিয়ে পড়ল। যুদ্ধ-পরবর্তী কালে ব্রঁতো ফ্রান্সে ফিরে এসে আন্দোলনকে আবার পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তা আর আগের উদ্দীপনা ফিরে পায় নি।

আন্দোলন হিসেবে স্যুররেআলিস্‌ম্‌ ফরাসি শিল্প জগতে বিশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। এই আন্দোলন শিল্প সাহিত্যে এক নতুন মুক্তির আবহাওয়া তৈরি করেছিল, কবিতার ক্ষেত্রে বিশের দশক এবং ত্রিশের দশকের গোড়ার দিক হলো এই আন্দোলনের সবচেয়ে উজ্জ্বল সময়। আন্দোলনের আরম্ভ থেকে অংশীদারদের মধ্যে পল এলুয়ার, লুই আরাগঁ, রবের দেস্‌নস্‌ এবং আঁদ্রে ব্রতোঁ কবি হিসেবে প্রথম সারিতে পড়েন। কিছুকাল এই আন্দোলনে জড়িত থেকে পরবর্তীকালে বেরিয়ে আসেন জাক প্রেভের এবং রনে শার। আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও কবি-চরিত্রের বিচারে এই আন্দোলনের পাশাপাশি রাখা যায় জঁ ককতো, পিয়ের রভেদি এবং জ্যুল স্যুপের্ভিয়েলকে। স্যুররেআলিস্ত আন্দোলন পরবর্তীকালের ফরাসি সাহিত্যকে

বিশেষভাবে প্রভাবিত এবং অনুপ্রাণিত করেছে। প্রথা-নির্দিষ্ট কর্ম অথবা ভাষারীতির বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়াসে এই আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ফরাসি সাহিত্যজগতের ঐতিহ্যের অধিকারে পরিণত হয়েছে।

চল্লিশের দশকে ফরাসি সাহিত্য তথা কবিতার নতুন অভিজ্ঞতা জার্মান অধিকারের বিরুদ্ধে, সংকীর্ণ অর্থে জাতীয়তাবাদী যা বৃহদর্থে মানবতাবাদী, প্রতিরোধের সাহিত্য। প্রতিরোধের বাস্তব সংগ্রাম কবিতাকে গণজীবনের সঙ্গে যুক্ত করে তাকে শক্ত মাটির উপর প্রতিষ্ঠিত করল। এই অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারও স্বভাবত পরবর্তী ফরাসি কবিতার শরীরে সঞ্চারিত হয়েছে।

সাহিত্য আন্দোলনের পাশাপাশি গোষ্ঠীর বাইরে স্বতন্ত্রভাবে কিছু গুরুত্ব-পূর্ণ কবি রয়েছেন যাঁদের সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে বিশ শতকের ফরাসী কবিতার আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। কেননা তাঁদের কবিতা অন্যতর নতুন অভি-জ্ঞতার সন্ধান। এরকম কবি হিসেবে প্রথমেই নাম করতে হয় অঁরি মিশো, ফ্রঁসিস পোঁজ এবং যোজেন গিলভিক-এর। মিশোর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে তির্যক দৃষ্টিতে দেখা জগতের বিরোধ এবং বৈপরীত্য। পোঁজ এবং গিলভিকের কবিতার প্রধান অবলম্বন বস্তুজগৎ।

যুদ্ধপরবর্তীকালের ফরাসি কবিতার বৈচিত্র্যসৃষ্টিকারী ঘটনা ইসিদোর ইস্যুর প্রবর্তনায় লেত্রিস্ত আন্দোলন। শুধু বাক্যসংস্থান নয়, শব্দকে পর্যন্ত ভেঙে চুরে লেত্রিস্তরা যা করতে চেয়েছেন তা দাদাবাদীর শূন্যগর্ভ ভাঙাচোরাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিশ শতকের ফরাসি কবিতার এক নতুন দিগন্ত ফরাসিভাষী অফরাসিদের কবিতা। এর মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ কবিদের কবিতা। বিশ শতকের ফরাসি কবিতার আধুনিকতার ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোজনা করেছে কৃষ্ণাঙ্গদের ঐতিহ্য এবং উপলব্ধি, যাকে বলা হয় 'নেগ্রিত্যুদ'। বিশ শতকের প্রথম সারির ফরাসি ভাষার কবিদের নাম করতে গেলে সেনেগালের কবি লেওপল্দ সেদার সঁগর এবং মার্তিনিকের কবি এমে সেজেরের নাম অবশ্যই করতে হয়।

একজন কবির কাব্যরচনার দুটো দিক থাকে—একদিকে কাব্যঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আর অন্যদিকে ব্যক্তি-চরিত্র এবং উচ্চারণভঙ্গি। বিশ শতকের তরুণতর ফরাসি কবি, অর্থাৎ যাঁরা পঞ্চাশ, ষাট বা সত্তরের দশকে লিখতে শুরু করেছেন এবং লিখছেন, তাঁদের কবিতা প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রথমেই

বলা দরকার যে দাদা বা স্যুররেআলিস্‌ম্‌-এর মত কোন গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন সাম্প্রতিক ফরাসি কবিতায় অনুপস্থিত ; বিশেষ বিশেষ পত্রিকাকে ঘিরে কবি-গোষ্ঠী থাকলেও যথার্থ কোন আন্দোলনের নামে কবিদের চিহ্নিত করা যায় না। এঁদের কাব্য-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারে প্রতীকিবাদের বিশ শতকের ঐতিহ্য, স্যুররেআলিস্‌ম্‌ এবং গোষ্ঠী পরিচয়হীন স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত কবিদের অভিজ্ঞতা সমন্বিত হয়েছে। কিন্তু, বর্তমান সংকলনে আমরা তরুণতর কবিদের উপস্থাপিত করছি না বলে তাঁদের ব্যক্তি-চরিত্র এবং উচ্চারণভঙ্গির আলোচনায় প্রবেশ করছি না।

বর্তমান সংকলন প্রসঙ্গে

বর্তমান সংকলনে আমরা বিশ শতকের আটজন ফরাসি ভাষার কবির কবিতা বাংলা অনুবাদে উপস্থাপিত করছি। কবিদের মধ্যে মাক্স জাকব, জাক প্রেভের, রনে শার, অঁরি মিশো এবং ফ্রঁসিস পোঁজ-এর কবিতা আমাদের দ্বিভাষিক (বাংলা-ফরাসি) সাহিত্য সংকলন সঁফ্লুয়ঁস (পূর্ববর্তী নাম ২৪)-এ প্রকাশিত অনুবাদ থেকে নির্বাচিত। ব্লেজ সঁদ্রার, গীয়োম আপলিনের ও লেওপল্‌দ সেদার সঁগর-এর কবিতার অনুবাদ নতুন করে যোগ করা হয়েছে। আপলিনের-এর কবিতার অনুবাদ 'লালচুল সুন্দরী' অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শঙ্খ ঘোষ সম্পাদিত 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত' নামে অনুবাদ-কবিতার সংকলনে প্রথম প্রকাশিত হয়। উপস্থাপিত কবিদের প্রত্যেকের বেশ কিছু কবিতা দেওয়া হয়েছে, যাতে উক্ত কবিদের কবিচরিত্রের একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় আর তার মাধ্যমে বিশ শতকের ফরাসি কবিতার একটা সাধারণ পরিচয় লাভ করা যায়। বিশ শতকের ফরাসি কবিতার অনুবাদের একটা পূর্ণতর সংকলন ভবিষ্যতে প্রকাশ করার ইচ্ছে আমাদের আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অতি সাম্প্রতিক কবিদের বাদ দিলে বিশ শতকের কবিদের অনেকে বিক্ষিপ্ত অনুবাদ বা আলোচনার মাধ্যমে এদেশে অল্পবিস্তর পরিচিত।

পরিশেষে অনুবাদ প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার। যে কোন অনুবাদে সাধারণত দু ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়—প্রথমত ভাষাতাত্ত্বিক, দ্বিতীয়ত সাংস্কৃতিক। শব্দের রূপ ও বিন্যাস, বাক্যের গঠন, ক্রিয়ার ভাব ও কাল, বিভিন্ন ধরনের অব্যয়ের ব্যবহার ইত্যাদির ব্যাপারে প্রত্যেক ভাষার নির্দিষ্ট

রীতিপদ্ধতি আছে। এই রীতিপদ্ধতির বিশেষ কিছু প্রবণতাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে বিশেষ যুগ এবং বিশেষ লেখকের রচনাশৈলী। অন্য কোন ভাষায় তার রূপ ও গঠনের প্রতিরূপ নির্মাণ ঐ ভাষার নিজস্ব কাঠামোর জন্য অসম্ভব। অনুবাদে যা করা হয় তা হোল মূল রচনার অর্থগত উপাদান বা বক্তব্যকে অন্য এক ভাষার কাঠামোয় প্রকাশ করা, ঐ ভাষায় একটা অনুরূপ নির্মাণের চেষ্টা। অনুবাদের সাংস্কৃতিক সমস্যা বলতে বোঝায় বিশেষ শব্দ, পদসমষ্টি বা বাক্যগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক উপাদান—যা অন্যভাষার প্রতিশব্দের রূপান্তরে লুপ্ত হয়ে যায়। কবিতায় যেহেতু ভাবাশরীরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কবিতার ভাষান্তর তাই দুরূহতম সংগ্রাম।

তবু সাহিত্য তথা কবিতার ভাষান্তর হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। যে কোন সাহিত্যানুরাগীকে বিশ্বসাহিত্যের বেশিরভাগ আস্বাদন করতে হয় অনুবাদের মাধ্যমে। বাংলাভাষায় শতাধিক বছর ধরে ফরাসি সাহিত্যের অনুবাদ হয়ে আসছে। তবে সে অনুবাদের অধিকাংশই ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর, অর্থাৎ তা রূপান্তরের রূপান্তর। এ জাতীয় অনুবাদের অনেক ত্রুটি নির্দেশ করা গেলেও বলতে হয়, এ ধরনের অনুবাদ অল্পবিস্তর পৃথিবীর সব সাহিত্যেই অনিবার্যভাবে হয়ে থাকে। বর্তমান সংকলনের অনুবাদগুলি ফরাসি থেকে করা। তবে সরাসরি ভাষান্তর যে সবসময় উৎকৃষ্ট হবে এমন কথা বলা যায় না। কেননা, যে ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে অনুবাদকের সেই ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষমতা না থাকলে ভাষান্তর অক্ষম প্রতিশব্দবিন্যাসে পর্যবসিত হয়। বিশেষভাবে একথা মনে রেখেই আমরা অনুবাদ নির্বাচন করতে চেষ্টা করেছি; অনুবাদের সাহিত্যমূল্যের কথা আমরা ভুলি নি।

এছাড়া, শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজি নয় এমন বিদেশী সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ পড়তে অভ্যস্ত বা পড়া শ্রেয় বলে বিবেচনা করেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের ধারণা, একটা বিদেশী ভাষার সাহিত্য অন্য একটা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে পড়াটা বেশ কিছুটা ঘুরপথে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছোনোর চেষ্টার সামিল, আর মাঝখানের দ্বিতীয় বিদেশী ভাষা পথ ও লক্ষ্যের মধ্যে একটা বাড়তি প্রাচীর তুলে রাখে। সেই প্রাচীরের বাধা দূর করার কাজে অংশীদার হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের এই সংকলন।



মাক্স জাকবের কবিতা

POEMES DE MAX JACOB

প্যারী থেকে ভের্সাই

পারী থেকে ভের্সাই
শান-বাঁধানো সড়ক পর পর
পঁচিশটা দল করে সাফাই
টহল দিয়ে সারাটা রাতভর।

ভেড়ার পালের আগে আগে
লোহার টুপি থাকেই থাকে রোজ
"প্রভু তোমার উৎসবের জন্যে লাগে
এসব এবং তোমার বাড়ির ভোজ।"

জানলা থেকে মিটমিটিয়ে
বেড়াল ওদের দেখে কাতার কাতার
জন্তুদের ছালচামড়া দিয়ে
তৈরী হবে ফিতে জুতোর জামার :

থামতে হয় চুঙ্গিখানায়
আটকোণা এই মাছিগুলোকে ছাড়ো
এগুলো চাই রাজার বিছানায়
মুখের জন্যে ভেড়ার ঠ্যাঙ হাড়ও
এবং পশম শোয়ার জন্যে আরও
উকুন এবং মশা
চাকরদের জন্যে তাদের হিসেব আছে কষা।

অরুণ মিত্র

আমার নিজস্ব রুচির নয় এমন কবিতা

বোদলেয়র, তোমাকে

হলি গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল এক শহর। তার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ডন জুয়ান, রথশিল্ড, ফাউস্ট ও এক শিল্পী।

রথশিল্ড বলল—আমি বিপুল সম্পদ জমা করেছি, কিন্তু তার থেকে কোনো আনন্দ পাই না বলে আরো টাকার পেছনে ছুটে চলেছি। আশা ছিল, প্রথম এক কোটি টাকা যে আনন্দ দিয়েছিল, আবার তা ফিরে পাব।

ডন জুয়ান বলল—আমি দুঃখের মধ্যেও ক্রমাগত প্রেমের সন্ধান করে চলেছি। নিজে ভালবাসতে না পেরেও অন্যের ভালবাসা পাওয়ার মত যন্ত্রণা নেই। তবু আমি প্রেমের সন্ধান করে চলেছি, প্রথম প্রেমের উন্মাদনা ফিরে পাবার আশায়।

শিল্পী বলল—আমি এক গোপন রহস্য আবিষ্কার করে বিখ্যাত হয়েছিলাম। তারপর আমি নিজের চিন্তাকে সচল রাখতে আরো গোপন রহস্য অনুসন্ধান করেছিলাম। কিন্তু তার ফলে ধ্বংস হয়েছিল আমার প্রথম আবিষ্কারের ফসল, আমার খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা। বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও আমি ফিরে যাচ্ছি আমার পুরনো ছকে।

ফাউস্ট বলল—আমি সুখের জন্য বিজ্ঞান ছেড়েছিলাম, কিন্তু আমি বিজ্ঞানে ফিরে যাচ্ছি, যদিও আমার কাজের পদ্ধতি আজকাল পুরনো, অচল। কেননা অনুসন্ধান ছাড়া আর কোনো সুখ নেই।

তাদের পাশে ছিল নকল আইভির মুকুট-পরা এক তরুণী। সে বলল—সবকিছু আমার একঘেয়ে লাগে। আমি বড় বেশী সুন্দরী।

আর হলি গাছের পেছন থেকে ঈশ্বর বললেন—আমি বিশ্বকে চিনি। সব আমার একঘেয়ে লাগে।

আকাশের রহস্য

নৃত্যোৎসব থেকে ফিরে আমি জানলায় বসে আকাশটাকে দেখলাম—দেখে মনে হল, মেঘগুলো যেন খাওয়ার টেবিলে বসা বুড়োদের বিশাল বিশাল মাথা—তাদের সামনে কেউ যেন পালক দিয়ে সাজানো সাদা একটা পাখি এনে দিচ্ছে। আকাশ পরিক্রমা করে একটা মস্ত বড় নদী বয়ে চলেছে। বুড়োদের মধ্যে একজন মাথা নিচু করে আমাকে দেখছিল—এমনকি আমার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ এই সময় জাদু কেটে গেল—আকাশে রইল শুধু ঝলমলে তারাগুলো।

সুলেখা চক্রবর্তী

ঊষা বা সন্ধ্যা

ধব্‌ধবে সাদা গম্বুজের কনুই থেকে আলো আসছে, সামনে থেকে আলো আসছে, আলোর সামনে দিয়ে সিঁড়িটা নেমেছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। না! ওটা দেখা যাবে না। শুধুমাত্র একটা ধাপে দাঁড়াবার জায়গায় আমার পিঠটা দেখা যাবে। যে দেওয়ালগুলো এখনো রাতের মধ্যে সেগুলোকে দেখা যাবে না, শুধু সেইসব লোকগুলোকে দেখা যাবে যারা এখনও খোপের ভেতর। প্রথমজন অন্ধকারের পোশাক পরা; রাত্রি ওর পোশাক ; দ্বিতীয় জনকে দেখিনি, অনেকটা আন্দাজ করেছি; তৃতীয় জন নেমে এসেছিলো, সে আমার কাছ পর্যন্ত এলো ; বাকিরা কেউ নড়েনি। যে নেমেছিল তার চৌখুপি কাটা প্যাণ্ট, তার ভুরুতে চুল আর তার চুলগুলো কালো, সে আমার হাতটা তার গালে রেখেছিলো কারণ তার গালের রঙ ছিলো পাকা ফলের রঙ; তার হাবভাব তুচ্ছ মানুষের এবং সে তার খোপের মধ্যে উঠে গেল। ধব্‌ধবে সাদা গম্বুজের কনুই থেকে আলো আসছে, আমার সামনে, আমার সামনে। এবং বুঝতে পারলাম যে, এই লোকগুলো ছিলো আমার ভবিষ্যৎ বইয়ের চরিত্র।

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

আমার কাঠের জুতো

আমার কাঠের জুতো, আমার কাঠের জুতো
কোথায় ফেলে এসেছি আমার কাঠের জুতো ?

সিঁড়ির তলায়
সার্ডিনের সিঁড়ি
মাঝখানে ডেকের সিঁড়ি

—আমার কাঠের জুতো, আমার কাঠের জুতো
কোথায় ফেলে এসেছি আমার কাঠের জুতো ?
—কবরখানার দরজায়
তোমাকে যেদিন কবর দেওয়া হয়েছিল।
—হা ঈশ্বর ! কি দুঃখের কথা।
আমি যে শপথ করেছিলাম
স্বর্গে অথবা নরকে মাটি নিয়ে যাব না।
সে প্রতিজ্ঞা ভুলে গেছি।

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী-শাসনবিশ

সত্যিকারের ধ্বংসাবশেষ

যখন আমার বয়স অল্প ছিল, আমি বিশ্বাস করতাম যে অশরীরীরা এবং পরীরা সর্বদা আমাকে পরিচালনা করবার জন্য সচেষ্ট থাকত। আমাকে যখন কেউ কোন আঘাত দিত, তখনও আমি ভাবতাম যে এরা একে অন্যের সঙ্গে আমার এবং শুধু আমারই মঙ্গল চিন্তা করে কথাবার্তা বলছে। বাস্তবের আঘাত এবং দুঃখকষ্ট আমাকে এই জায়গায় গায়ক করে তুলেছে, আমাকে শিখিয়েছে যে দেবতারা চিরকালই আমাকে পরিত্যাগ করে এসেছে। হে অশরীরী, হে পরীর দল ! আমাকে আবার সেই আগেকার কল্পনা-বিলাস ফিরিয়ে দাও।

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

নেপলসের ভিখারিণী

আমি যখন নেপলসে ছিলাম, আমার প্রাসাদের দ্বারে একটি ভিখারিণী থাকত। গাড়িতে ওঠার আগে আমি তাকে কিছু পয়সা ছুঁড়ে দিতাম। কোন-দিন কোন ধন্যবাদ না পেয়ে অবাক হয়ে একদিন সেই ভিখারিণীর দিকে তাকালাম। দেখলাম, যাকে আমি ভিখারিণী বলে ভাবতাম আসলে সে একটি সবুজ রঙকরা কাঠের বাক্স—যার মধ্যে ভরা লাল রঙের মাটি আর কিছু আধপচা কলা···

সুলেখা চক্রবর্তী

সাহিত্যিক রীতিনীতি

একদল ভদ্রলোকের সঙ্গে যখন আরেকদল ভদ্রলোকের দেখা হয়, অভি-বাদনের সঙ্গে মৃদু হাসি মিশে না যাওয়াটা দুর্লভ। যখন একদল ভদ্রলোকের সঙ্গে একজন ভদ্রলোকের দেখা হয়, তখন অভিবাদন বেশ আন্তরিক হলে অভিবাদন কমতে থাকে আর কখনো কখনো দলের শেষজন অভিবাদন করে না। মনে হয়, আমি লিখেছি যে তুই একটি মেয়েছেলের স্তনের বোঁটায় কামড়ে দিয়েছিলি। আর স্তন থেকে রক্ত পড়েছিল। তুই যদি বিশ্বাস করিস এ ব্যাপারটা আমি করেছি তাহলে তুই আমাকে অভিবাদন করিস কেন? আর আমি যদি ভাবতাম তুই কাজটা করেছিস তাহলে আমি তোকে অভি-বাদন করতাম কি? চশমা-পরা মোটা এক মহিলা যার হাতে-বোনা একটা আলখাল্লা আছে, তার বাড়িতে আমাদের দেখা হোল, তুই আমার করমর্দন করলি, তবে যে ঘরে মহিলার ছেঁড়া চেয়ার ছিল সে ঘরটাতে আমরা ছিলাম, আর তুই আমার মাথায় ছেঁড়া চেয়ারের তাকিয়া ছুঁড়ে মারলি। তাকিয়াগুলি ছিল নিতান্ত অষ্টাদশ শতকের। লোকে বলে, নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করার পরিবর্তে আমি তোকে তাকিয়া ছুঁড়ে মেরেছি। কথাটা সত্যি কিনা আমি জানি না। যখন আমার দলের সঙ্গে তোর দেখা হবে তখন যে অভি-বাদন করে না সেই শেষের জন যদি আমি হই, ভাবিস না ওটা তাকিয়ার ঘটনার জন্য। কিন্তু আমার দলের সঙ্গে যদি তোর দলের দেখা হয়, আর তাতে যদি মৃদু হাসি বিনিময় হয় ভাবিস না তার মধ্যে আমার হাসিও আছে।

পুষ্কর দাশগুপ্ত

মানব-প্রেম

কেউ কি কোলাব্যাঙকে রাস্তা পার হতে দেখেছে? এ এক ক্ষুদে মানুষ: কোনো পুতুলও এর চেয়ে ছোট্ট নয়। মানুষটা হাঁটু ঘষটে চলেছে: লোকে বলবে সে লজ্জিত···? না, সে বেতো রুগী। একটা পা পেছনে থেকে যায়, সেটাকে আবার সামনে নিয়ে আসে। এভাবে সে যাচ্ছে কোথায়? সে বেরোল নর্দমা থেকে, হতচ্ছাড়া সঙ। রাস্তায় ঐ কোলাব্যাঙকে কেউ নজর করেনি। আগে কেউ আমাকে রাস্তায় নজর করত না, এখন বাচ্চারা আমার হল্দে তারা দেখে তামাসা করে। ভাগ্যবান কোলাব্যাঙ, তোমার হল্দে তারা নেই।

অরুণ মিত্র

সাহিত্য আর কবিতা

লোরিয়ঁর কাছাকাছি, ঝলমলে রোদ আর আমরা বেড়াচ্ছিলাম, দেখ-ছিলাম সেপ্টেম্বরের এই দিনগুলিতে সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, উচ্ছ্বসিত হয়ে বন, প্রাকৃতিক দৃশ্য, খাড়া পাহাড়গুলি ডুবিয়ে দিচ্ছে। শীঘ্রই গাছের তলায় সরু পথের বাঁকগুলো ছাড়া আর কিছুই সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করার জন্য রইল না। আর পরিবারগুলি সব পরস্পরের কাছাকাছি এগিয়ে আসতে লাগল। আমাদের মধ্যে নাবিকের পোশাক-পরা একটা বাচ্চা ছিল। ও বিষণ্ণ হয়েছিল। হাত ধরে সে আমায় বলল, বুঝলেন, আমি নেপল্সে ছিলাম। জানেন তো নেপল্সে এন্তার গলি আছে, রাস্তায় একা একা কাটানো যায়, কেউ আপনাকে দেখবে না, নেপল্সে লোকজন যে বেশি নেই তা নয়, তবে এত রাস্তা আছে যে জনপ্রতি কখনই শুধু একটা রাস্তা পড়ে না। —বাবা বললেন, ছেলেটা আপনাকে যত বাজে কথা বলে যাচ্ছে, নেপল্সে ও যায় নি। —বুঝলেন মশায়, আপনার ছেলে কবি।—ভালোই, তবে ও যদি সাহিত্যিক হয় তাহলে আমি ওর ঘাড় ভেঙে দেবো।—সমুদ্র সরু পথের বাঁকগুলোকে শুকনো রেখে দিয়েছিল, সেগুলি তাকে নেপল্সের স্বপ্ন দেখাচ্ছিল।

পুষ্কর দাশগুপ্ত

স্তব্ধ অরণ্যে এখনও রাত্রি আসে নি—দুঃখের ঝড় এসে এখনও বিক্ষুব্ধ করে তোলে নি গাছের পাতাগুলোকে। স্তব্ধ অরণ্য থেকে বনদেবীরা পালিয়ে গেছে—তারা আর এখানে ফিরবে না।

স্তব্ধ অরণ্যে ছোটনদীর কোন ঢেউ নেই, কেননা এখানে পাহাড়ী নদী প্রায় জল ছাড়াই বাঁক নিয়ে বয়ে যায়।

স্তব্ধ অরণ্যে একটি গাছ আছে—অন্ধকারের মতন তার কালো রঙ—গাছের পেছনে মানুষের মাথার চেহারার একটি ঝোপ সেই ঝোপে আগুন লেগেছে—রক্ত আর সোনার আগুনে সেই ঝোপটি জলছে।

স্তব্ধ অরণ্যে—যেখানে বনদেবীরা আর ফিরবে না—আছে শুধু তিনটি কালো ঘোড়া—এই তিনটি কালো ঘোড়ায় চড়ে এক সময় তিন মেজাই রাজা তীর্থযাত্রায় এসেছিলেন। রাজারা আর ঘোড়ার পিঠে নেই—কোথাও নেই—ঘোড়ারা মানুষের মতন কথা বলে।

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

আমার যে কোন একটা দিন

দুটো নীল পাত্রে পাম্পের জল ভরে নিতে চেয়ে, মইয়ের উচ্চতার জন্য মাথা ঘুরে গিয়ে; আমার একটা বাড়তি পাত্র থাকায় ফিরে এসে এবং মাথা ঘুরতে থাকায় পাম্পে ফিরে না গিয়ে, আমার প্রদীপ থেকে তেল চুঁইয়ে পড়ে তাই একটা বড় রেকাব কিনতে বাইরে গিয়ে; প্রদীপের অনুপযোগী, চায়ের সরঞ্জামের চৌকো রেকাব ছাড়া অন্য কোন রেকাব খুঁজে না পেয়ে এবং রেকাব ছাড়াই বেড়িয়ে এসে। সাধারণ গ্রন্থগারের দিকে হেঁটে ও আমার দুটো নকল কলার পরা রয়েছে এবং কোন নেকটাই নেই পথে তা নজরে এসে; বাড়ি ফিরে ভিলড্রাক মশায়ের কাছে একটা পত্রিকা চাইতে তাঁর বাড়ী গিয়ে এবং পত্রিকাটিতে জ্যুল রমঁ্যা মশায় আমার নিন্দা করেছেন ব'লে পত্রিকাটি না নিয়ে। অনুশোচনায় না ঘুমিয়ে, অনুশোচনা আর হতাশায়।

অশিস রায়চৌধুরী

মৃত্যু

রাতে বাইরের রাস্তাগুলো তুষারে ভর্তি ; ডাকাত হোল সৈন্যরা ; হো হো হাসি আর তলোয়ার দিয়ে আমায় আক্রমণ করা হয়, আমার পোশাক আশাক সব খুলে নেওয়া হয় : ফের আরেকটা চৌকোণায় পড়ে যাওয়ার জন্য আমি ছুটে পালাই। এটা কি কোন সৈন্যদের ছাউনির উঠোন না কি সরাইখানার উঠোন ? কত তলোয়ার ! কত বল্লমধারী ! তুষার পড়ছে। আমাকে ইঞ্জেকসনের ছুঁচ ফুটিয়ে দেওয়া হোল : আমায় মারার জন্য একটা বিষ ; ক্রেপে ঢাকা কঙ্কালের মাথা আমাব আঙুল কামড়ে ধরে। পথের অস্ফুট আলো তুষারের ওপর আমার মৃত্যুর আলো ফেলে।

পুষ্কর দাশগুপ্ত

আমাদের মফস্বলের বিষাক্ত জীবন

তোমার প্রহরগুলো মুছে ফেলার রবার।
তোমার স্বপ্নগুলো মুছে ফেলার রবার।
তোমার শিকারীদের পথগুলো মুছে ফেলার রবাব।
তোমার বলিরেখাগুলো মুছে ফেলার রবার।
আমাদের ব্যথার কুন্তলের মুখোস।

আশিস রায়চৌধুরী

গীয়োম আপলিনেরের কবিতা

POEMES DE GUILLAUME APOLLINAIRE

গীয়োম আপলিনের

লালচুল সুন্দরী

সকলের সামনে এই আমি কাণ্ডজ্ঞান আছে যার এমন মানুষ
জীবন যে জানে আর মৃত্যুর যা জানা যায় তাও জানে
অনুভব করেছে যে যন্ত্রণা ও প্রেমের পুলক
মাঝে মাঝে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে নিজের ভাবনা
কয়েকটা ভাষা যার জানা
দেশ মন্দ দেখেনি যে
গোলন্দাজ পদাতিক বাহিনীতে যুদ্ধও করেছে
মাথায় জখম হয়ে ক্লোরফর্মের পর কাটাছেঁড়া করিয়েছে
ভয়ংকর লড়াইতে শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের হারিয়েছে
পুরনো এবং নতুনের যতখানি জানা যায় আমি জানি
আজ আমাদের মধ্যে আর আমাদের জন্যে যুদ্ধ এই
এ নিয়ে ব্যগ্র না হয়ে আমি হে বন্ধুরা
ঐতিহ্য এবং আবিষ্কার শৃঙ্খলা দুর্গম খোঁজা এই দীর্ঘ
বিবাদের বিচার সহজে করি

ঈশ্বরের মুখের ছাঁদে তোমাদের মুখ গড়া
যে মুখ শৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছু নয়
তোমরা আজ আমাদের আর যত শৃঙ্খলার অবতারদের
তুলনা যখন করো আমাদের ক্ষমাঘেন্না করে নিও
আমরা যারা সর্বত্রই দুর্গমকে খুঁজি
তোমাদের শত্রু আমরা নই
আমরা চাই নিজেদের দিতে এক বিশাল আশ্চর্য রাজ্য
পুষ্পে পুষ্পে যেখানে রহস্য ফোটে যার ইচ্ছে করবে সে চয়ন
যেখানে নতুন আলো যার রঙ কখনো দেখেনি
হাজার অচিন্ত্য ছায়াচর

তাদের বাস্তবে আনতে হবে
নিত্য আমরা হৃদয় সন্ধান করি সে এক বিরাট দেশ
যেখানে নীরব সব কিছু
এবং সময় যাকে বিতাড়িত করা চলে ফিরিয়েও আনা যায়
আমাদের নিশ্চয় করুণা কোরো আমরা যারা সর্বদাই
লড়ে চলি ভবিষ্যৎ আর সীমাহীন এ দুয়ের সীমানায়
আমাদের ভুলভ্রান্তি আমাদের পাপ করুণার চোখে দেখো

এই তো এসেছে গ্রীষ্ম রুদ্র ঋতু
আমার যৌবন মৃত যেমন বসন্ত মৃত আজ
হে সূর্য এ এক গাঢ় প্রদীপ
যুক্তির অন্তকাল
আমার প্রতীক্ষা থাকে
অনুগামী হব বলে যতক্ষণ না সম্মুখে স্পষ্ট
সে ধরে অপূর্ব কায়া আমি ভালোবাসি শুধু তাকে
সে আসে আমাকে টানে যেন টানে চুম্বক লোহাকে
তার রূপ মনোহর লাগে
লালচুল সুন্দরীর মতো

সোনার কুন্তল তার বলা চলে
যেন চিরন্তন বিদ্যুতের প্রভা নভস্তলে
কিংবা যেন আগুনের শিখা ঝলকিত
শুকনো কাঠ গোলাপের পাপড়িতে বিধৃত

আমাকে দেখিয়ে হাসো হাসো
পৃথিবীর যত লোক বিশেষত এখানকার যারা
কারণ কত যে বস্তু রয়েছে যা তোমাদের বলতে ভয় পাই
এত সব বস্তু তোমরা যা আমাকে বলতেই দেবে না
তোমরা কোরো আমাকে করুণা

অরুণ মিত্র

ফটোগ্রাফি

তোমার হাসিটি আমাকে টানে যেমন
একটি ফুল আমায় টানতে পারতো
ফটোগ্রাফি তুমি বাদামী ব্যাঙের ছাতা
বনের
সুন্দর
শুভ্রতা সেখানে
জ্যোৎস্না
একটি শান্ত বাগানের মধ্যে
জীবন্ত জলধারা আর শয়তান মালীতে পূর্ণ
ফটোগ্রাফি তুমি তীব্র উত্তাপের ধোঁয়া
সুন্দর
আর তোমার মধ্যে
ফটোগ্রাফি
সব অবসন্ন সুর
সেখানে লোকে শোনে
একঘেয়ে গান
ফটোগ্রাফি তুমি ছায়া
সূর্যের
সুন্দর

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

কুড়ি বছরের
যুবক
এমন ভয়ংকর সব কাণ্ডকারখানা তুমি দেখেছো
তোমাব শৈশবের মানুষগুলোর সম্বন্ধে তোমাব ধারণাটা কি

তুমি   তুমি
একশ
বাবেরও   পরিচিত
বেশি
মুখো   সাহস আর ধূর্ততার সঙ্গে
মুখি
মৃত্যুকে
দেখেছো
তুমি
জানো
তোমার দুঃসাহস সঞ্চালিত করো   না
জীবনটা
তোমার পবে যাবা আসবে   কি
জি
তাদের মধ্যে   নি
স

তরুণ যুবা
তুমি উৎফুল্ল তোমার স্মৃতি রক্তাক্ত
তোমার অন্তরও লাল
আনন্দে
তোমার কাছাকাছি যারা প্রাণ হারিয়েছে তাদের প্রাণশক্তি
তুমি নিজের ভেতর টেনে নিয়েছ

তোমার মধ্যে আছে সংকল্পের দৃঢ়তা
এখন বিকেল পাঁচটা আর তুমি মরতে
জানবে
নিদেনপক্ষে তোমার অগ্রজদের চেয়ে ভালোভাবে
অন্তত আরো নিষ্ঠা নিয়ে
কেননা জীবনের চেয়ে মৃত্যুর সঙ্গে
তুমি বেশি পরিচিত
হে বিগত দিনের মাধুর্য
স্মরণাতীত মন্থরতা

পুষ্কর দাশগুপ্ত

একটি কবিতা

সে ঢুকল
সে বসল
লাল চুল শিলীভূতের দিকে সে তাকাল না
দেশলাই-এর কাঠি দপ্ করে জ্বলে ওঠে
সে চলে গেছে

১৯১৩

পুষ্কর দাশগুপ্ত

ইসপাহান

তোমার গোলাপের জন্য
আরো বহু দীর্ঘ পথ
আমি পার হতাম

তোমার সূর্য সেই সূর্য নয়
যে আর সব জায়গায়
আলো দেয়
আর তোমার গানগুলি যা উষার সঙ্গে খাপ খায়
এর পর থেকে সেগুলি আমার
শিল্পের পরিমাপ
ওদের স্মৃতির অনুসরণে
আমি বিচার করব
আমার কবিতা চারু
কলা আর তোমাকে
প্রিয় মুখ

ভোরের সঙ্গীতময় ইস্পাহান
তার বাগানের গোলাপের সৌরভের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়

আমার অন্তরকে সুরভিত করে নিয়েছি
গোলাপের গন্ধে
চিরজীবনের জন্য

নীল চীনে মাটির তৈজসে ভরা ধূসর ইস্পাহান
তোমায় গড়া
হয়েছিল বুঝি
টুকরো টুকরো আকাশ আর মাটি দিয়ে
মাঝখানে ছেড়ে রাখা হয়েছে
বিশাল একটা আলোর ফোকর

এই
চৌকোণা চক শাহী ময়দান
লাফিযে লাফিয়ে চলা
সামান্য কটা ছোট গাধার
পক্ষে খুবই বিরাট
আর সাদা ছাতার তলায ঠাঁই পাওয়া
দাড়িওয়ালা ঐ তরুণ বণিকদের মত দেখতে
সূর্যের
মেহেদি রাঙানো দাড়ির দিকে
তাকিযে গাধাগুলি
এমন চমৎকার ডাক ছাড়তে জানে

এখানে আমি রযেছি পপলার গাছগুলির সহোদর

ইযোরোপের সন্ততিদের মধ্যে সুন্দর পপলারগুলিকে চিনে নাও
হে আমার কম্পিত সহোদররা এশিযায় যারা প্রার্থনা করছ

বন্য হরিণের শিঙের মতন বাঁকানো একজন পথচারী
গ্রামোফোন
হিজিবিজি লেখা
ছোট্ট দোকান

পুষ্কর দাশগুপ্ত

যুদ্ধ

লড়াইয়ের কেন্দ্রীয় ধমনী
শ্রুতির মাধ্যমে যোগাযোগ
'শোনা আওয়াজের' দিকে তাক করে গুলি ছোঁড়া হয়
১৯১৫-র তরুণেরা
আর বিদ্যুৎবাহী লোহার তারগুলি

যুদ্ধের বীভৎসতা নিয়ে তাই আর কেঁদো না
এর আগে আমাদের ছিল কেবল
ভূপৃষ্ঠ আর সমুদ্রপৃষ্ঠ
এর পর আমরা পাবো অতল গহ্বর
ভূগর্ভ আর বিমান চালনার আকাশমার্গ
কর্ণধার
তারপর তারপর
আমরা পাবো সবটুকু আনন্দ
সেই বিজয়ীদের যারা আরাম করে
নারী জুয়া কারখানা ধাতু
আগুন স্ফটিক গতি
কণ্ঠ দৃষ্টি একান্ত স্পর্শ
আর একই সঙ্গে দূর
আরো দূর
এই পৃথিবীর ওপার থেকে আসা স্পর্শের মধ্যে

পুষ্কর দাশগুপ্ত

নিজের ওপরও…

নিজের ওপরও আমার আব কোন করুণা নেই
নিজের স্তব্ধতার যন্ত্রণাকে আমি প্রকাশ করতে পারি না
যে কথাগুলি আমার বলার ছিল সেগুলি সব
তারায় পরিণত হয়েছে
কোন এক ইকারুস আমার প্রতিটি চোখ অবধি উঠে আসতে
চেষ্টা করে
আর সূর্যালোকের বাহক আমি দুই ছায়াপথের
মাঝখানে দগ্ধ হই
বুদ্ধির ধর্মতাত্ত্বিক জানোয়ারগুলিকে আমি কি করেছি

একদা যারা যারা গেছে তারা আমায় সমাদর করতে ফিরে এল
আমি আশা করেছিলাম জগতের সমাপ্তি
অথচ আমার সমাপ্তি ঘূর্ণিঝড়ের মত সোঁ সোঁ শব্দে উপস্থিত হয়

পুষ্কর দাশগুপ্ত

আমার বাগানে

সত্যি আমরা যদি সতেরোশ যাট সালে বেঁচে থাকতাম
এই পাথরের বেঞ্চিটার ওপর তুমি যা পাঠোদ্ধার করলে, আনা,
এটাই কি ঠিক সেই তারিখ
আর দুর্ভাগ্যক্রমে আমি হতাম জার্মান
আর ভাগ্যক্রমে তোমার কাছে থাকতাম
আমরা আবোল তাবোল ভালোবাসার কথা বলে যেতাম
সারাক্ষণ প্রায় ফরাসিতে
আর আত্মহারাভাবে আমার বাহুলগ্ন হয়ে
তুমি শুনতে পেতে আমি তোমায় পিথাগোরাসের কথা বলছি
আর একইসঙ্গে আধঘণ্টার মধ্যে যে কফি খাওয়া হবে
তার কথাও ভাবতে ভাবতে

আর হেমন্ত হোত এই হেমন্তের মতই
আঙুরলতা আর বৈঁচির মুকুট মাথায়

আর বারবার চকিতে খুব নুয়ে পড়ে আমি অভিবাদন করতাম
নধরকান্তি আর ঢিমেতেতালা সম্ভ্রান্ত মহিলাদের

দীর্ঘ সায়াহ্নগুলিতে
একা একা আর ধীরেসুস্থে আমি সেবন করতাম
গাঢ় তোকে কিংবা মালভোয়াজি
আমার হিস্পানী পোশাকটা আমি পরে নিতাম
জার্মান বুঝতে যিনি বিন্দুমাত্র ইচ্ছুক নন আমার সেই দিদিমা
তাঁর পুরনো ঘোড়ার গাড়িতে

যে পথ ধরে আসেন সে রাস্তায় যাওয়ার জন্য
তোমার স্তনযুগল, গ্রামীণ জীবন আর আশেপাশের
মহিলাদের নিয়ে
আমি পুরাণকাহিনী ভরা পদ্য লিখতাম

প্রায়ই কোন চাষার পিঠে আমি
আমার ছড়ি ভাঙতাম

শুয়োরের মাংস খেতে খেতে সংগীত শুনতে
আমি ভালোবাসতাম

আমি তোমায় দিব্যি গেলে বলছি তুমি যখন
ঐ লালচুল ঝিটার ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে চুমু খেতে আমায় ধরে ফেলতে
তখন আমি জার্মান ভাষায় দিব্যি গালতাম

মার্টেল বনে তুমি আমায় ক্ষমা করে দিতে

একটুখানি গুনগুন করে আমি সুর ভাঁজতাম
তারপব অনেকক্ষণ কান পেতে আমরা শুনতাম গোধূলির শব্দ

১৯১২

পুষ্কর দাশগুপ্ত

বিজয়

একটি মোরগ ডাকছে আমি স্বপ্ন দেখছি আর পাতাভরা ডাল
তাদের পাতা দোলাচ্ছে দেখতে হতভাগা জাহাজীদের মত

জাল ইকারুসের মত ডানাওয়ালা আর ঘুরতে থাকা
অন্ধেরা পিঁপড়ের মত হাত পা ছুঁড়ছে
বৃষ্টিতে ফুটপাতে আলোর প্রতিফলনে ওরা নিজেদের দেখছিল

ওদের হাসি আঙুরের থোকার মত টাল করা

মণি আমার যে তুমি কথা বলছিলে তোমার ঘর ছেড়ে আর বেরিয়ো না
শান্ত হয়ে ঘুমোও তোমার নিজের ঘরেই তুমি রয়েছো সবকিছুই তোমার
আমার বিছানা আমার বাতি আর আমার ফুটো হয়ে যাওয়া লোহার টুপি

চাউনি সঁ্যা-ক্লোদের আশেপাশে কাটা দামী নীলা
দিনগুলি ছিল এক একটা নিঁখুত পান্না

তোমাকে আমার মনে পড়ে উল্কার শহর
যে রাতগুলিতে কিছুই ঘুমোত না তখন ওরা শূন্যে ফুটে উঠত
আলোর বাগানগুলি যেখানে আমি ফুলের স্তবক চয়ন করেছি

ঐ আকাশকে ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে তোমার ক্লান্ত হওয়ার কথা
সে তার হেঁচকি সামলে রাখুক
কল্পনা করা কঠিন
সাফল্য লোককে কতখানি নির্বোধ আর নিশ্চেষ্ট করে তোলে

তরুণ অন্ধদের পরিষদে জিজ্ঞাসা করা হোল
আপনাদের কি কোন ডানাওয়ালা তরুণ অন্ধ নেই

হে মুখগুলি, মানুষ নতুন এক ভাষার সন্ধানে
যার সম্পর্কে কোন ভাষার ব্যাকরণবিদের কিছুই বলার থাকবে না

আর এই পুরনো ভাষাগুলি এমনই মরোমরো
যে প্রকৃতপক্ষে অভ্যাসবশে আর দুঃসাহসের অভাবে
এখনো তাদের কবিতায় ব্যবহার করা হচ্ছে

অথচ ওরা বীতস্পৃহ রোগীর মত
বলছি তো লোকে অবিলম্বে নীরবতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবে
চলচ্চিত্রে মূকাভিনয়ই যথেষ্ট

তবু এসো কথা বলার গোঁ ধরি
এসো জিব নাড়াই
এসো থুথু ছেটাই
লোকে চায় নতুন ধ্বনি নতুন ধ্বনি নতুন ধ্বনি
লোকে চায় স্বরধ্বনিহীন ব্যঞ্জন
গম্ভীর ভারী ব্যঞ্জন
লাট্টুর ধ্বনির অনুকরণ কর
বিরামহীন অনুনাসিক একটা ধ্বনিকে টিক্‌টিক্ করে যেতে দাও
জিভ দিয়ে চুক্‌চুক্ আওয়াজ কর
অসভ্যের মত যে খায় তার চাপা আওয়াজকে ব্যবহার কর
থুথু ফেলার মহাপ্রাণ ঘর্ষণধ্বনিও চমৎকার একটা ব্যঞ্জনধ্বনি তৈরী করতে পারে
বিচিত্র ওষ্ঠ্য বায়ুনিঃসরণও তোমার উক্তিকে দিব্যদৃষ্টিময় করে তুলতে পারে
যখন খুশি ঢেকুর তুলতে অভ্যস্ত হও
আর আমাদের স্মৃতির ভেতর দিয়ে গির্জের একটা ঘণ্টাধ্বনির তুলনায়
কোন্ বর্ণটাই বা গাম্ভীর্যপূর্ণ
সুন্দর নতুন জিনিস দেখার আনন্দ
আমরা খুব একটা পছন্দ করি না
সখি আমার ত্বরা করো
মনে রেখো, রেলগাড়ি তোমাকে আর মুগ্ধ নাও করতে পারে
তোমার পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা তাড়াতাড়ি তার দিকে তাকাও
ঐ চলন্ত রেলপথগুলি
অবিলম্বে জীবনের গণ্ডীর বাইরে চলে যাবে
ওগুলো হয়ে যাবে সুন্দর আর হাস্যকর
আমার সামনে দুটি আলো জ্বলছে
দুটি নারী যেন হিহি হাসছে
দীপ্ত তামাসার সামনে
আমি বিষণ্ণভাবে মাথা নোয়াই
ঐ হাসি ছড়িয়ে পড়ে
সর্বত্র
হাতের ভঙ্গিতে কথা বল আঙুল দিয়ে তুড়ি দাও

তবলা বাজানোর মতো গালের ওপর চাঁটি মারো
আহা কথাগুলি
ওরা মার্টেলের বনে
অশ্রুসজল কাম ও নিষ্কামের পিছু নেয়
আমি মহানগরীর আকাশ

সমুদ্রের দিকে কান পাতো

সমুদ্র দূরে গোঙায় আর একা একা চিৎকার করে
ছায়ার মত বাধ্য আমার কণ্ঠস্বর
অবশেষে জীবনের ছায়া হতে চায়
হতে চায় হে প্রাণময় সমুদ্র তোমার মতন অবাধ্য

যে সমুদ্র অসংখ্য নাবিকের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে
ডুবে যাওয়া দেবতাদের মত আমার প্রচণ্ড চিৎকার সে গিলে ফেলে
আর সূর্যালোকে ডানা বিস্তার করা পাখিদের ফেলা ছায়া ছাড়া
সমুদ্র আর কিছুই বরদাস্ত করে না

উক্তি আকস্মিক আর কোন এক ঈশ্বর শিহরিত হয়
এগিয়ে এসো আর আমায় ধরো আমি অনুতাপ করছি তাদের সেই
হাতগুলির জন্য
যারা তা বাড়িয়ে দিতো আর সবাই মিলে আমায় সমাদর করত
আগামীকাল বাহুর কোন্ মরূদ্যান আমায় অভ্যর্থনা জানাবে
নতুন জিনিস দেখার সেই আনন্দ তুমি জানো কি

হে কণ্ঠস্বর আমি সমুদ্রের ভাষা বলছি
আর বন্দরে রাত্রি শেষ সরাইখানাগুলি
আমি লের্ন এর হায়ড্রা যতটা নয় তার চেয়ে বেশি গোঁয়ার

শহরে ঘাঁটাঘাঁটি করা নিপুণ আঙুল নিয়ে
আমার দুহাত যেখানে সাঁতার কাটে সেই রাস্তা
চলে যায় অথচ কে জানে আগামীকাল
রাস্তা অনড় হয়ে যাচ্ছে কি না
কে জানে কোথায় হবে আমার পথ

ভেবে দেখো রেলপথ
অল্পকালের মধ্যে অচল আর বাতিল হয়ে যাবে
তাকাও

সবার আগে জয় হবে
দূরে ভালো করে দেখার
কাছ থেকে
সব কিছু দেখার
আর সব কিছুর নতুন একটা নাম হোক

পুষ্কর দাশগুপ্ত

হাউই সংকেত

নিভৃত রাত্রিতে গ্রামগুলি দাউ দাউ করে জ্বলছিল
একজন কৃষক গালভেস্টনের দিকে তার মোটরগাড়ি
চালিয়ে নিয়ে যায়

কে ঐ হাউই-সংকেত ছুঁড়েছে

তবুও দরজাটা তোমার খোলা রাখলেই ভালো হয়
আর তারপর বাতাস কাঠ চেরাই করা করাতীর মত
তোমার মধ্যে ভূতের আতঙ্ক জাগিয়ে তুলবে

তোমার জিভ
তোমার কণ্ঠস্বরের কাচের জারে
লাল মাছ

অথচ এই অনুতাপ
প্রায় ঠিক যেন চোখ ধাঁধানো শীতের চেয়ে সাদা একটা নার্স
দিগন্তে যখন মিলিয়ে যায়
দিনগুলির একটা পল্টন দূরের পাহাড়গুলির চেয়ে
নীল আর মোটরগাড়ির গদি যতটা না তার চেয়েও নরম

পুষ্কর দাশগুপ্ত



ব্লেজ সঁন্ড্রারের কবিতা

POEMES DE BLAISE CENDRARS

ব্লেজ সঁদ্রার

সঙ্গীতশিল্পীদের উৎসর্গিত

ট্রান্সসাইবেরিয়ান আর ফ্রান্সের ছোট্ট জানের গদ্য

সে সময়ে আমি ছিলাম কিশোর
সবে ষোল বছর আমার বয়স আর ইতিমধ্যেই ছেলেবেলার কথা
আমার আর মনে পড়ছিল না
আমি ছিলাম আমার জন্মস্থান থেকে ৪৮০০০ মাইল দূরে
আমি ছিলাম মস্কোয়, হাজার তিনটি গির্জের চুড়ো আর সাতটি
স্টেশনের শহরে,
আর সাতটি স্টেশন আর হাজার তিনটি গম্বুজ আমার অসহ্য হয়ে ওঠে নি
কেননা আমার কৈশোর ছিল এমন গনগনে আর এমন উন্মাদ যে
আমার হৃদয় জ্বলতে থাকত বারেবারে ইফিজাস-এর মন্দিরের
মত অথবা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়
মস্কোর রেড স্কোয়ারের মত।
আর আমার চোখ প্রাচীন পথগুলি আলোকিত করত।
আর তখনই আমি এমন বাজে কবি হয়ে গিয়েছিলাম যে
শেষ অব্দি পৌঁছতে আমি জানতাম না।

ক্রেমলিনটা ছিল যেন একটা প্রকাণ্ড তাতার কেক
মচ্‌মচে সোনার,
তাতে ধবধবে সাদা ক্যাথিড্রালগুলির বাদাম
আব ঘণ্টাগুলির মধুময় সোনা…
বুড়ো এক সন্ন্যাসী নভ্‌গরোদ-এব ইতিকথা আমায় পড়ে শোনাত
আমার তেষ্টা পেত
আর কৌণিক হরফগুলির আমি পাঠোদ্ধার করতাম
তারপর, আচমকা, পবিত্র-আত্মার পায়রাগুলি স্কোয়ারের
ওপর দিয়ে উড়ে চলে যেত

আর আমার হাতচুটিও উড়ে যেত, আলবাট্রসের গুঞ্জরণে
আর এটা, এটাই হল শেষ অস্পষ্ট স্মৃতি শেষ দিনের
একেবারে শেষ ভ্রমণের
আর সমুদ্রের।

তবুও আমি ছিলাম নিতান্ত বাজে কবি।
শেষ অব্দি পৌঁছতে আমি জানতাম না।
আমার খিদে পেত
আর সবকটা দিন আর কাফের মধ্যে সবকটা নারী আব
সবকটা গেলাস
পারলে আমি তাদের পান করে নিতাম আর ভেঙে দিতাম
আর সবকটা শোকেস আর সবকটা রাস্তা
আর সবকটা বাড়ি আর সবকটা জীবন
আর রাস্তার এবড়োখেবড়ো শানের ওপর ঘূর্ণিবেগে ঘুরপাক খাওয়া
ছ্যাকড়া গাড়ির সবকটা চাকা
পারলে আমি ওদের তলোয়ার নিয়ে লড়াইয়ের মাঠে ঢুকিয়ে দিতাম
পারলে আমি সবকটি হাড় গুঁড়িয়ে দিতাম
আর সবকটি জিব টেনে বের করে আনতাম
আর আমার মাথা খারাপ করা পোশাকের তলায় সবকটি উলঙ্গ আব
অদ্ভুত বিরাট শরীর তরল পদার্থে পরিণত করতাম…
রুশ বিপ্লবের বিরাট লাল খৃস্টের আবির্ভাবের পূর্বাভাস আমি
অনুভব করছিলাম…
আর সূর্যটা ছিল একটা দুষ্ট ক্ষত
কয়লার আগুনের মতো যার মুখ খুলে যেত।

সে সময়ে আমি ছিলাম কিশোর
সবে ষোল বছর আমার বয়স আর ইতিমধ্যেই ছেলেবেলার কথা আমার
আর মনে পড়ছিল না
আমি ছিলাম মস্কোয়, সেখানে নিজেকে আমি আগুনের শিখায়
লালন করতে চাইছিলাম

আর যারা আমার চোখে তারকা ছড়িয়ে দিচ্ছিল সেই
গম্বুজ আর স্টেশন আমায় অসহ্য করে তোলেনি
সাইবেরিয়ায় কামান গর্জাচ্ছিল, যুদ্ধ চলছিল
ক্ষুধা শীত মহামারী কলেরা
আমুরের ঘোলা জলধারা লক্ষ লক্ষ শবদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল
সবকটা স্টেশনে সবকটা শেষ ট্রেনকে ছেড়ে যেতে দেখছিলাম
কেউ আর যেতে পারছিল না কেননা আর টিকিট দেওয়া হচ্ছিল না
যে সৈনিকরা চলে যাচ্ছিল পারলে ওরা থেকে যেত…
বুড়ো এক সন্ন্যাসী আমায় নভ্‌গরোদ-এর ইতিকথা গেয়ে শোনাচ্ছিল।

আমি, বাজে কবি, কোথাও যেতে চাইছিলাম না,
সর্বত্র আমি যেতে পারতাম
আর তাছাড়া পয়সা কামানোর চেষ্টায় যাওয়ার জন্য
ব্যবসায়ীদের তখনো যথেষ্ট টাকাকড়ি ছিল।
প্রতি শুক্রবার ভোরবেলা ওদের ট্রেন ছাড়ছিল।
লোকে বলছিল বহু লোক মারা গেছে।
একজন নিয়ে যাচ্ছিল একশ পেটি এলার্ম ঘড়ি আর ব্ল্যাক ফরেস্টের
কোকিল-ডাকা ঘড়ি
আরেক জন, টুপির বাক্স, সিলিণ্ডার আর একগাদা নানান ধরনের
শেকিল্ডের ছিপিখোলার যন্ত্র
আরেক জন, মালমোএ-র কিছু কফিন ভর্তি কৌটোয় ভরা খাবার
আর তেলে ডোবানো সার্ডিন
এছাড়া ছিল বহু মেয়েমানুষ
মেয়েমানুষ ভাড়া দেওয়ার জন্য পায়ের ফাঁকের আচ্ছাদন যাদের দিয়ে
কাজ চলে
কফিনেরও
মেয়েমানুষগুলো সব ট্রেড লাইসেন্স করা
লোকে বলছিল ওখানে বহু লোক মারা গেছে
মেয়েমানুষগুলো কন্‌সেসন টিকিটে যাচ্ছিল
আর তাদের প্রত্যেকের ব্যাংকে এক একটা কারেণ্ট অ্যাকাউণ্ট ছিল।

এবার, শুক্রবারের এক সকালে, অবশেষে এল আমার পালা
তখন ডিসেম্বর মাস
আর গয়নার এক ক্যানভাসার খারবিন-এ যাচ্ছিল তার সঙ্গে
আমিও বেরিয়ে পড়লাম
এক্সপ্রেস ট্রেনে আমাদের ছিল দুটি খুপরি আর সঙ্গে ফরৎজাইমের
জহরতের ৩৪টা পেটি
জার্মান মাল "মেড ইন জার্মানী"
লোকটা আমায় নতুন পোশাক পরিয়ে দিয়েছিল আর ট্রেনে চড়ার
সময় আমি একটা বোতাম হারিয়ে ফেলেছিলাম
—কথাটা আমার মনে আছে, কথাটা আমার মনে আছে, তারপর থেকে কথাটা
আমি প্রায় ভেবেছি—
পেটির ওপর আমি শুয়ে ছিলাম আর লোকটা আমায় চকচকে যে ব্রাউনিং
পিস্তলটাও দিয়েছিল ওটা নিয়ে খেলতে পারায় আমার খুব মজা লাগছিল

আমি বেপরোয়া খোশমেজাজে ছিলাম
মনে হচ্ছিল ডাকাত ডাকাত খেলছি
আমরা গোলকুণ্ডার ধনভাণ্ডার লুঠ করেছি
আর ট্রান্সসাইবেরিয়ান এক্স্প্রেসের দৌলতে, আমরা তাকে
পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে লুকিয়ে রাখতে চলেছি
তাকে রক্ষা করতে হবে যারা জুল ভের্ন-এর বেদেদের আক্রমণ
করেছিল সেই উরালের লুঠেরাদের হাত থেকে
খুঙ্গুজদের হাত থেকে চীনের প্রহরী কুকুরদের হাত থেকে
আর দালাই লামার খ্যাপা বেঁটে মোঙ্গলদের হাত থেকে
আলিবাবা আর চল্লিশ চোরের হাত থেকে
আর পাহাড়ের সেই ভয়ংকর বুড়োর সাকৃরেদদের হাত থেকে
আর বিশেষ করে, সবচেয়ে আধুনিকদের হাত থেকে
হোটেলের সিঁধেলদের
আর আন্তর্জাতিক এক্সপ্রেস ট্রেনের বিশেষজ্ঞ ডাকাতদের হাত থেকে।

আর তা সত্ত্বেও, আর তা সত্ত্বেও

একটা বাচ্চা ছেলের মত আমার মন খারাপ লাগছিল
ট্রেনের দোলা
আমেরিকান মনোরোগ চিকিৎসকদের 'রেলপথ গূঢ়ৈষা'
দরজার—গলার স্বরের—শীতে জমে যাওয়া লাইনের ওপর খ্যাঁচখ্যাঁচ
করা চাকার ধুরার আওয়াজ
আমার ভবিষ্যতের সোনার পাত
আমার ব্রাউনিং পিস্তল পিয়ানো আর ট্রেনের পাশের কামরায়
তাস-খেলোয়াড়দের দিব্যিগালা
জান-এর মনমাতানো উপস্থিতি
নীল চশমা পরা লোকটা যে অস্থিরভাবে অলিন্দে পায়চারি করছিল
আর যেতে যেতে আমার দিকে তাকাচ্ছিল
মেয়েদের ঘষাঘষির শব্দ
আর বাষ্পের হিস্‌হিস্‌
আর আকাশের চিহ্নিত পথে উন্মত্ত চাকার অন্তহীন শব্দ
শার্সিব কাচ ঢাকা তুষারকণায়
নিসর্গ নেই !
আর পেছনে, সাইবেরিয়ার প্রান্তর নিচু আকাশ আর বিরাট বিরাট ছায়া
একবার ওঠে একবার নামে
আমি শুয়ে আছি একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে
কম্বলটা রঙবেরঙ
আমার জীবনের মত
আর আমার জীবন স্কটল্যাণ্ডের
এই আলোয়ানের চেয়ে
আমাকে বেশি গরম করে রাখে না
আর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা একটা এক্সপ্রেস ট্রেনেব হাওয়াকাটা নাকে
দেখা পুরো ইয়োরোপটা
আমার জীবনের চেয়ে বেশি সমৃদ্ধ নয়
আমার রিক্ত জীবন
এই ফেঁসে যাওয়া আলোয়ান
সোনা ভর্তি পেটিগুলোর ওপর

যাদের নিয়ে আমি ঘুরছি
স্বপ্ন দেখা যাক
সিগারেট খাওয়া যাক
আর মহাবিশ্বের একমাত্র অগ্নিশিখা
একটা নগণ্য চিন্তা…

ওগো ভালোবাসা, আমার প্রণয়িণীর কথা ভাবলে
হৃদয়ের গভীর থেকে আমার চোখে জল আসে
ও তো বাচ্চা একটা মেয়ে ছাড়া কিছুই নয়, এক বেশ্যাবাড়ির অন্দরমহলে
ওকে আমি খুঁজে পেলাম এরকম ম্লান, নিষ্কলংক।

বাচ্চা একটা মেয়ে কেবল, সোনালি চুল, হাসিখুসি আর মনমরা
সে স্মিতহাসি হাসে না বা কখনো কাঁদে না ;
কিন্তু তার চোখের গভীরে, যখন সে তোমাকে সেখানে চুমুক দিতে দেয়,
থরথর করে কবির ফুল, রুপোর একটা কোমল লিলি।

মেয়েটি নিশ্চুপ আর শান্ত, তার কোন ত্রুটি নেই,
তোমার কাছে আসায় বহুক্ষণ কেঁপে কেঁপে ওঠে ;
এখান সেখান থেকে, উৎসব থেকে আমি যখন তার কাছে আসি,
সে এক পা এগোয়, তারপর চোখ বোজে—আর এক পা এগোয়
কেননা সে আমার প্রিয়া, আর অন্য সব নারীদের
অগ্নিশিখার দীর্ঘ শরীরের ওপর সোনার পোশাকই কেবল আছে,
আমার অভাগিনী সখি এমন নিঃসঙ্গ,
একেবারে সে নগ্ন, তার কোন শরীর নেই—সে নিতান্তই নিঃস্ব।

সে কেবল সাদাসিধে, ক্ষীণ একটি ফুল,
কবির ফুল, সামান্য একটা রুপোর লিলি,
একেবারে শীতল, একেবারে একা, আর এরই মধ্যে এমন শুকিয়ে যাওয়া যে
তার হৃদয়ের কথা ভাবলে চোখে আমার জল আসে।

আর এই রাতটা আরো একলক্ষ রাতের মতন যখন রাতের বেলা
একটা ট্রেন ছুটে চলে

—ধূমকেতুগুলি খসে পড়ে—
আর যখন বয়স কাঁচা হলেও পুরুষ আর নারী আনন্দ পায় সঙ্গমে।

আকাশটা ফ্ল্যাণ্ডার্সে জেলেদের ছোট্ট গ্রামে একটা গরীব সার্কাসের ছেঁড়া
তাঁবুর মতন
সূর্য ধোঁয়া ওগরানো একটা লণ্ঠন
আর ট্রাপিজের সবচেয়ে ওপরে একটি মেয়েছেলে চাঁদ হয়ে আছে।
ক্ল্যারিওনেট পিস্টন একটি তীক্ষ্ণ বাঁশি আর একটা রদ্দি ঢোল
আর এইতো আমার দোলনা
আমার দোলনা
সেটা সবসময় পিয়ানোর কাছেই থাকত আমার মা যখন বিটোফেনের
  সোনাটা বাজাতেন
আমি আমার শৈশব কাটিয়েছি ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগানে
আর স্কুল পালিয়ে, স্টেশনে স্টেশনে ছেড়ে দিতে যাওয়া
  ট্রেনগুলির সামনে
এখন, সবকটা ট্রেনকে আমি আমার পেছনে ছুটিয়েছি
বাজেল—টিম্বাক্টু
আমি ওতঈ আর লোঁশঁ-র ঘোড়ার মাঠে বাজি ধরেছি
প্যারিস-নিউইয়র্ক
এখন, আমার সারা জীবনের পথ ধরে আমি সবকটা ট্রেনকে
ছুটিয়েছি
মাদ্রিদ-স্টকহোম
আর আমার সবকটা বাজি আমি হেরেছি
আছে শুধু এক প্যাটাগোনিয়া, প্যাটাগোনিয়া, যা আমার বিপুল বিষণ্ণতার
  সঙ্গে খাপ খায়, প্যাটাগোনিয়া, আর দক্ষিণ সমুদ্রে একবার
  পাড়ি দেওয়া
আমি পথ চলছি
আমি সারাক্ষণ থেকেছি পথে
আমি ফ্রান্সের ছোট্ট জেআন-কে নিয়ে পথ চলছি
ট্রেনটা একটা মারাত্মক লাফ মেরে ফের তার সবকটা চাকার ওপর বসে পড়ে

ট্রেনটা তার চাকার ওপর বসে পড়ে
ট্রেনটা সবসময় তার সবকটা চাকার ওপর বসে পড়ে

"ব্লেজ, বল না, আমরা কি মোঁমার্ত্র্ থেকে অনেক দূরে?"

আমরা দূরে, জান, সাত দিন তুমি গাড়িতে চলেছ
তুমি মোঁমার্ত্র্ থেকে দূরে, সেই মোঁমার্ত্র্-পাহাড় থেকে যে তোমাকে লালন
করেছে সেই সাক্রে-ক্যর থেকে যার বুকে তুমি মুখ গুঁজে ছিলে
অদৃশ্য হয় প্যারিস আর তার বিশাল অগ্নিকুণ্ড
শুধু রয়েছে আবহমান ছাই
ঝরে পড়া বৃষ্টিধারা
ফুলে ফেঁপে ওঠা পচে শুকিয়ে যাওয়া ডালপালার স্তূপ
পাক খেতে থাকা সাইবেরিয়া
ছড়িয়ে পড়া তুষারের ভারী চাদর
আর নীল হয়ে যাওয়া শূন্যে অন্তিম বাসনার মত কাঁপতে
থাকা খ্যাপামির ঘণ্টা।
সীসার রঙ দিগন্তের বুকে ট্রেন ধুক ধুক করে চলে
আর তোমার বেদনা মুখ বিকৃত করে হাসে…

"বলনা, ব্লেজ, আমরা কি মোঁমার্ত্র্ থেকে অনেক দূরে।"

উদ্বেগ
ভুলে যাও উদ্বেগ
যাত্রাপথে সবকটা ফাটলপড়া বাঁকানো স্টেশন
সেগুলি যাতে ঝুলে রয়েছে সেই টেলিগ্রাফের তার
ওদের টুঁটি টিপে ধরা আর হাত পা ছোঁড়া দাঁত-খিচানো খাম্বাগুলি
সংসার হাত পা ছড়িয়ে দেয় আর ধর্ষকামী কোন হাতে নিপীড়িত
অ্যাকর্ডিয়ানের মত সেঁধিয়ে যায়
আকাশের ফাটলগুলির ভেতর, খেপে যাওয়া ইঞ্জিনগুলো
উধাও হয়ে যায়
আর গর্তের মধ্যে

মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া চাকাগুলি—মুখ—গলার স্বর
আর আমাদের পেছনে পেছনে ঘেউ ঘেউ করা দুর্ভাগ্যের কুকুরগুলি
দৈত্যগুলিকে শৃংখলমুক্ত করে দেওয়া হয়েছে
লোহালক্কড়
সবকিছু একটা ভুল স্বর
চাকার বুম বুম বুম
ধাক্কা
আবার লাফ
আমরা একজন কালা লোকের মাথার ভেতর ঝড়…
"বলনা, ব্লেজ, আমরা কি মোঁমার্ত্র্ থেকে অনেক দূরে ?"

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমার মাথা তুমি খারাপ করে দিচ্ছ, তুমি তা বেশ জানো,
আমরা অনেক দূরে
টগবগ করা উন্মাদনা ইঞ্জিনের ভেতর ডাক ছাড়ছে
কলেরা মহামারী আমাদের চলার পথে জলন্ত অঙ্গারের মতো দেখা দিচ্ছে
সুড়ঙ্গের একেবারে ভেতরে যুদ্ধে আমরা অদৃশ্য হই
খানকী ক্ষুধা ছত্রখান মেঘগুলোকে আঁকড়ে থাকে
আর লড়াইয়ের বিষ্ঠা শবদেহের দুর্গন্ধ গাদায়
ওর মতো করো, নিজের কাজ কর……

"বলনা, ব্লেজ, আমরা কি মোঁমার্ত্র্ থেকে অনেক দূরে ?"

হ্যাঁ, আমরা দূরে আমরা দূরে
সবকটা বলির পাঁঠা এই মরুভূমিতে টেঁসে গেছে
ঐ ঘেয়ো জানোয়ারের পালের ঘণ্টাধ্বনি শোন তোমস্ক
চেলিয়াবিনস্ক কেইনস্ক ওবি তাইশেৎ ভের্কনে
উদিনস্ক কুর্গান সামারা পেনসা-তুলুন
মাঞ্চুরিয়ায় মৃত্যুই হলো
আমাদের কূলের ঘাট আমাদের শেষ আশ্রয়
ভয়ানক এই যাত্রা
গতকাল সকালে

ইভান উলিচের চুল সাদা হয়ে গেল
আর কোলিয়া নিকোলাই ইভানোভিচ পনের দিন যাবৎ আঙুল কামড়াচ্ছে·
মৃত্যু দুর্ভিক্ষ ওদের মত হও নিজের কাজ কর
এর দাম একশ পয়সা, ট্রান্স সাইবেরিয়ান এক্সপ্রেসে এর দাম একশ রুবল্
জর গায়ে যদি কাঁটা বেঞ্চি আর টেবিলের তলায় লালচে হয়ে ওঠো
শয়তান পিয়ানো বাজাচ্ছে
তার গাঁটওয়ালা আঙুল সমস্ত নারীকে উত্তেজিত করে
নিসর্গ
ছেনিগুলি
নিজের কাজ কর
খারবিন পর্যন্ত······

"বলনা, ব্লেজ, আমরা কি মোঁমার্ত্র্ থেকে অনেক দূরে ?"

না তবে···আমায় জালিয়ো না···আমায় শান্তিতে থাকতে দাও
তোমার পাছাগুলো ছুঁচলো
তোমার পেট টকো আর তোমার গনোরিয়া হয়েছে
পারী তোমার কোলে এই শুধু দিয়েছে
একটুখানি অন্তরও···কেননা তুমি দুঃখী
আমার কষ্ট হচ্ছে আমার কষ্ট হচ্ছে আমার কাছে এসো আমার বুকের ওপর
চাকাগুলি সব্‌পেয়েছির দেশের হাওয়া কল
আর হাওয়া কলগুলি ভিখিরির ঘোরাতে থাকা লাঠি
আমরা মহাশূন্যের পা-কাটা আতুর
আমাদের চারটে ক্ষতের ওপর আমরা গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছি
আমাদের ডানাগুলি কামড়ে নেওয়া হয়েছে
আমাদের সাতটি পাপের ডানা
আর সবকটা ট্রেন শয়তানের লাটিম
হাঁস-মুরগি থাকার পেছনের উঠোন
আধুনিক জগৎ
দূরবর্তী আরো অনেক দূরে
আর যাত্রাপথের শেষে একজন মেয়েমানুষ সঙ্গে নিয়ে পুরুষ হওয়াটা ভয়াবহ··

"বলনা, ব্রেজ, আমরা কি মোঁমাত্র্‌ থেকে অনেক দূরে ?"

আমার দয়া হচ্ছে আমার দয়া হচ্ছে
আমার বিছানায় এসো
আমার বুকের ওপর এসো
তোমায় আমি একটা গল্প বলছি…

আহা এসো ! এসো !

ফিজি দ্বীপপুঞ্জে অনন্ত বসন্ত বিরাজ করে
আলস্য
লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতর নারী-পুরুষকে অনড় করে দেয়
আর তপ্ত উপদংশ কলাঝাড়ের নিচে এদিক ওদিক
ঘুরে বেড়ায়
প্রশান্ত মহাসাগরের হারিয়ে যাওয়া দ্বীপগুলিতে চলো !
ওদের ফিনিক্স আর মার্কিজ্‌-এর নাম রয়েছে
বোর্নিও আর জাভা
আর বেড়ালের আকৃতি সুলাবেশী দ্বীপ

আমরা জাপানে যেতে পারব না
মেক্সিকোতে চলো !
উঁচু উঁচু মালভূমির ওপর ট্যুলিপ গাছগুলি ফুলে ভরা
বাড়ন্ত লতাগুল্ম সূর্যের চুলের গোছা
বলা যায় চিত্রকরের রঙদানি আর তুলির গোছা
ঘণ্টাপেটানোর মত কানে তালা লাগানো রঙ
রুসো ওখানে ছিল
ওখানে সে তার জীবনের চোখ ঝলসে দিয়েছে
স্বর্গের পাখি, লায়ার
টুকান, মকিং বার্ড
আর মধুচুষ কালো লাইলাকের বুকে বাসা বাঁধে
চলো !

কোন আজটেক মন্দিরের বিপুল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আমরা প্রেম করব
তুমি হবে আমার প্রতিমা
বাচ্চাদের রঙবেরঙ প্রতিমা একটু কুৎসিত দেখতে আর অদ্ভুতভাবে আশ্চর্য
ওগো চলো !

তুমি যদি চাও আমরা এরোপ্লেনে যাবো আর হাজার হ্রদের
        দেশের ওপর দিয়ে উড়ে যাবো
রাত সেখানে অতিরিক্ত দীর্ঘ
প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষ আমার মোটর দেখে ভয় পেয়ে যাবে
আমি মাটিতে নামব
আর ম্যামথের ফসিল হাড় দিয়ে আমি আমার বিমানের জন্য
        একটা ছাউনি তৈরী করব
আদিম আগুন আমাদের হতভাগ্য ভালোবাসাকে উত্তপ্ত করবে
মেরুর কাছাকাছি আমরা নিজেদের বেশ বড়লোকী চালে
        ভালোবাসব
ওগো চলো !

জান জানসোনা খুকুমণি মণি মেনি মেনা
বিল্লীসোনা আদুরে আমার আমার খুকু সোনার খনি
ঘুমঘুম গোলগাল
গাজর আমার-লেবেঞ্চুষ
সোনামণি আমার প্রাণ
পাজী মেয়ে
প্রাণের আমার ছাগলছানা
ধনধন
টুকি
সে ঘুমোয়।

সে ঘুমোয়
আর পৃথিবীর সবকটা সময়ের একটাও সে গিলে ফেলে নি

স্টেশনে স্টেশনে চকিতে দেখা সবকটা মুখ
সবকটা ঘড়ি
প্যারিসের সময় বার্লিনের সময় সেন্ট পিটার্সবুর্গের সময়
আর সবকটা স্টেশনের সময়
আর উফায়, গোলন্দাজের রক্তমাখা মুখ
আর গ্রদ্‌নো-র অর্থহীনভাবে উজ্জ্বল ডায়াল
আর ট্রেনের নিরন্তর এগিয়ে চলা
রোজ সকালে লোকে হাতঘড়ি মিলিয়ে নেয়
ট্রেন এগিয়ে যায় আর সূর্য পিছিয়ে পড়ে
কিছুই তাতে ঘটে না, সুরেলা ঘণ্টাধ্বনি আমি শুনতে পাই
নৎর্‌দামের গম্ভীর, বিশাল ঘণ্টা
লুভ্‌র্‌-এর তীব্র সেই ঘণ্টা যা বার্তেলেমি-তে বেজেছিল
ব্রুজ-লা-মর্ত-এর মরচে পড়া ঘণ্টা
ন্যু ইয়র্ক গ্রন্থাগারের বৈদ্যুতিক ঘণ্টা
ভেনিস অভিযান
আর মস্কোর ঘণ্টাগুলি, লাল ফটকের ঘড়ি
আমি যখন একটা দপ্তরে ছিলাম যে আমাকে সময়ের হিসেব দিত
আর আমার যত স্মৃতি
বাঁকগুলিতে ট্রেন গুমগুম করে চলে
ট্রেন ছুটে চলে
গ্রামোফোনে একটা জিপসি গৎ ঘর্‌ঘর্‌ করছে
আর জগৎসংসার, প্রাগের ইহুদীপাড়ার ঘড়ির মত প্রাণপণে
উল্টো ঘুরছে।

বাতাসের গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়ে ফেল
এই যে শেকল ছেঁড়া ঝড়গুলি আওয়াজ তুলছে
পথের জড়ানো জালের ওপর দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে ঘূর্ণিবেগে
শয়তানের লাটিম
কিছু কিছু ট্রেন কখনো একে অন্যের দেখা পায়না
আর কতগুলো চলতে চলতে হারিয়ে যায়

স্টেশনমাস্টাররা দাবা খেলে
পাশা
বিলিয়ার্ড
এক গুলিতে দুগুলি ছোঁয়া

রেলের লৌহপথ নতুন এক জ্যামিতি
সাইরাকিউজ
আর্কিমেডিস
আর যারা তার মুণ্ডু কেটেছিল সেই সৈন্যেরা
আর দাঁড়টানা জাহাজ
আর জলযান
আর যে বিস্ময়কর যন্ত্র তিনি উদ্‌ভাবন করেছিলেন
আর যত সব হত্যাকাণ্ড
পুরাকালীন ইতিহাস
আধুনিক ইতিহাস
ঘূর্ণিঝড়
জাহাজডুবি
এমনকি টাইটানিকের ডোবাও যা আমি খবরের কাগজে পড়েছি
এত সব চিত্রানুষঙ্গ যা নিজের পদ্যে কখনো আমি ফুটিয়ে
তুলতে পারি না
কেননা আমি এখনো নিতান্ত বাজে কবি
কেননা বিশ্বজগৎ আমায় পেরিয়ে চলে যায়
কেননা রেলপথে দুর্ঘটনার জন্য বীমা করতে আমি
অবহেলা করেছি
কেননা শেষ অব্দি যেতে আমি জানি না।
আর আমার ভয় করছে।

আমার ভয় করছে
আমি শেষ অব্দি যেতে জানি না

আমার বন্ধু শাগালের মতো আমি একটা উদ্ভট চিত্রমালা
আঁকতে পারি
কিন্তু ভ্রমণের সময় কিছু টুকে রাখিনি
গীয়োম আপলিনের যেমন বলে
"আমার অজ্ঞতাকে ক্ষমা করুন
পদ্যের পুরোনো খেলাটা আমি আর জানিনা বলে আমায়
ক্ষমা করুন"
যুদ্ধ সম্পর্কিত যা কিছু কুরোপাটকিন-এর স্মৃতিকথায়
পড়তে পারা যায়
অথবা এমন নিষ্ঠুরভাবে চিত্রিত জাপানী খবরের কাগজে
আমার অত খোঁজখবর নিয়ে লাভটা কি
স্মৃতির চমকে লাফিয়ে ওঠার হাতে
নিজেকে সমর্পণ করি···

ইর্কুৎস থেকে যাত্রাটা হয়ে উঠল খুবই মন্থর
খুবই দীর্ঘ
প্রথম যে ট্রেনটি বৈকাল হ্রদ ঘুরে যাচ্ছিল আমরা তাতে ছিলাম
পতাকা আর চীনে লণ্ঠনে ইঞ্জিনটাকে সাজানো হয়েছে
জারের বন্দনাগীতির বিষণ্ণ রেশের মধ্যে আমরা স্টেশন ছেড়েছিলাম
চিত্রকর হলে এই ভ্রমণের শেষ আঁকতে অনেকটা লাল, অনেকটা হলুদ আমি
ঢালতাম
কেননা আমার ধারণা যে আমরা সবাই ছিলাম এক আধটু পাগল
আর এক বিপুল প্রলাপ আমাদের সহযাত্রীদের বিচলিত মুখকে
রক্তিম করে তুলছিল
যখন আমরা সেই মঙ্গোলিয়ার কাছে এসে পৌঁছাচ্ছি
যে অগ্নিকাণ্ডের মত গোঁ গোঁ করছিল।
ট্রেন তার গতিবেগ শ্লথ করে দিয়েছিল
আর চাকার অবিশ্রান্ত ঘ্যাঁচঘ্যাঁচ আওয়াজের মধ্যে আমি
উপলব্ধি করছিলাম
এক চিরন্তন প্রার্থনাগীতির

কোঁপানি আর ব্যাকুল সুর।

আমি দেখেছি
আমি দেখেছি শব্দহীন ট্রেনগুলি কালো ট্রেনগুলি যেগুলি
দূরপ্রাচ্য থেকে ফিরে আসে আর ভূতের মতন চলে যায়
আর আমার চোখ, পেছনে ঝোলানো লণ্ঠনের মত, ঐ ট্রেনগুলোর
পেছনে পেছনে ছোটে
তালগাতে ১০০০০০ আহত লোক চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুমুখী
আমি ক্রাসনইআর্স্কের হাসপাতালগুলি ঘুরে দেখেছি
আর খিলোক-এ আমরা ক্ষিপ্ত সিপাহীদের দীর্ঘ একটা
সারির পাশ কাটিয়ে গেছি
আর চিকিৎসাকেন্দ্রে আমি দেখেছি অর্গানের চড়া সুরে ঝরঝর করে
রক্ত ঝরা হাঁ করা ক্ষতমুখ
আর কেটে বাদ দেওয়া প্রত্যঙ্গগুলি চারপাশে নাচছিল বা
ভারী হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিল
সবগুলি মুখে সবগুলি হৃদয়ে অগ্নিকাণ্ড
হাবা আঙুলগুলি সবকটা কাচের শার্সিতে তাল ঠুকছিল
আর ভয়ের চাপে চাউনিগুলি ফোঁড়ার মত ফেটে পড়ছিল
সবকটা স্টেশনে সবকটা গাড়ির কামরা পোড়ানো হচ্ছিল
আর আমি দেখেছি
আমি দেখেছি কামার্ত দিগন্তগুলির তাড়া খাওয়া ৬০ ইঞ্জিনের ট্রেনগুলি
আর তার পেছনে পেছনে মরিয়া হয়ে উড়ে যাওয়া
পালে পালে কাককে
পোর্ট-আর্থারের পথ ধরে
অদৃশ্য হয়ে যেতে।

চিতা-য় আমরা কয়েকদিনের জন্য হাঁফ ছাড়ার সময় পেলাম
রেললাইনের গোলমালের জন্য পাঁচ দিনের বিরতি
আমরা সেই বিরতি কাটালাম ইয়ানকেলেভিচ মশায়ের বাড়িতে যিনি তাঁর
একমাত্র মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইছিলেন

তারপর আবার ট্রেন ছাড়ল
আমিই এবার পিয়ানোয় বসলাম আর আমার দাঁত কনকন করছিল
ভাবলেই দেখতে পাই এমন স্তব্ধ সেই অন্তঃপুর বাবার দোকান
আর মেয়ের চোখদুটি যে মেয়ে রাতে আমার বিছানায় আসত
মুসোর্গস্কি
আর হুগো ভোল্‌ফ-এর লোকগীতি
আর গোবি-মরুভূমির বালুকা
আর খাইলার-এ মালবাহী সাদা উটের একটা সারি
আমার দৃঢ় বিশ্বাস ৫০০ কিলোমিটারের বেশি পথ ধরে আমি মদের ঘোরে
ছিলাম
আমি পিয়ানোয় বসেছিলাম আর এটাই শুধু আমি দেখেছিলাম
ঘুরে বেড়ানোর সময় উচিত চোখ দুটো বুজে থাকা
ঘুমনো
পারলে আমি কত যে ঘুমোতাম
চোখ বুজে গন্ধ শুঁকে সবকটা দেশ আমি চিনে নিতে পারি
আওয়াজ শুনেই আমি সবকটা ট্রেন চিনে নিতে পারি
ইয়োরোপের ট্রেনগুলির গতি চার তালের আবার এশিয়ার ট্রেনগুলো
পাঁচ বা সাত তালের
অন্যগুলি হোল ঘুমপাড়ানি গান যায় চুপিসাড়ে
আর এমন কিছু ট্রেন আছে যারা চাকার একঘেয়ে আওয়াজে আমায়
মেতেরলঁ্যাক-এর অনড় গদ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়
চাকার আবোলতাবোল সমস্ত রচনারই আমি পাঠোদ্ধার করেছি
এবং রুদ্র সৌন্দর্যের ছড়িয়ে থাকা উপাদানগুলি
আমি জড়ো করেছি
সেগুলি আমার কাছে রয়েছে
আর সেগুলি আমার ওপর ভর করে আছে।

জিজিকা আর খারবিন
তার বেশি দূরে আমি যাইনা
এই শেষ স্টেশন

খারবিন-এ আমি নেমে পড়লাম যেন কেউ রেড-ক্রশের
অফিসে এইমাত্র আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেল।

ওগো প্যারিস
বিপুল অগ্নিকুণ্ড যাতে তোমার রাস্তাগুলির জলন্ত যত
চেলাকাঠ আড়াআড়ি রাখা আর সঙ্গে আছে তোমার পুরনো
বাড়িগুলি যারা ওপর থেকে নুয়ে আছে আর গা গরম করছে
ঠাকুর্মা-দিদিমাদের মত
আর ঐ যে পোস্টারগুলি, লাল সবুজ রঙচঙে আমার সংক্ষিপ্ত অতীত যেমন
হলুদ
হলুদ বিদেশে ফ্রান্সের উপন্যাসের গর্বিত রঙ
বড় বড় শহরে চলন্ত বাসে গা ঘষতে আমার ভালো লাগে
স্যাঁ-জের্মাঁ-মোঁমার্ত্র রুটের বাসগুলো আমাকে মোঁমার্ত্র পাহাড়ের
সামনে নিয়ে যায়
মোটরগুলি সোনার ষাঁড়ের মত ডাক ছাড়ে
গোধূলির গোরুগুলি সাক্রে-ক্যর-এর ডাল ভেঙে খায়
ওগো প্যারিস
কেন্দ্রীয় স্টেশন যত সব বাসনার ঘাট যত সব দুশ্চিন্তার মোড়
শুধুমাত্র মনোহারী দোকানের দরজায় এখনো একটুখানি আলো রয়েছে
ইয়োরোপীয় বিখ্যাত দ্রুতগামী ট্রেন ও ট্রেনে শয়ন-কামরার আন্তর্জাতিক
বাণিজ্য-সংস্থা আমাকে তার প্রচারপুস্তিকা পাঠিয়েছে
ওটা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর গির্জা
আমার কিছু কিছু বন্ধু আমাকে পাঁচিল এর মত ঘিরে রাখে
ওদের ভয় কখন আমি চলে যাই আমি হয়ত আর ফিরব না
যেসব নারীর আমি দেখা পেয়েছি তারা সবাই দিগন্তে দিগন্তে
দাঁড়িয়ে পড়ে
করুণ ওদের অঙ্গভঙ্গি আর বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার আলোকস্তম্ভের মতো
বিষণ্ণ ওদের চাউনি
বেলা, অ্যাগনেস, ক্যাথরিন আর ইতালিতে আমার ছেলের মা
আর উনি, আমেরিকায় আমার প্রেয়সীর মা

কিছু কিছু সাইরেনের আর্তনাদ আছে যা আমার অন্তরকে বিদীর্ণ করে

ওখানে মাত্যুরিয়ায় একটা পেট এখনো কেঁপে কেঁপে উঠছে প্রসবের
সময় যেমন হয়
ভালো হোত
ভালো হোত যদি আমার এই ভ্রমণগুলি না করতাম
আজ রাতে এক দারুণ প্রেম আমায় কষ্ট দিচ্ছে
আর অনিচ্ছা সত্বেও আমি ফ্রাঙ্কের ছোট জেআনের কথা ভাবছি
বিষণ্ণতা ভরা এক সন্ধ্যায় তার সম্মানে এই কবিতা আমি লিখেছি
জান
বেঁটেখাটো বারবনিতা
আমার মন খারাপ আমার মন খারাপ
আমি 'দুরন্ত খরগোশ' রেস্তোরাঁয় যাবো আমার হারানো যৌবনকে
স্মরণ করতে
আর কয়েকটা ছোটপেগ মদ খেতে
তারপর আমি একা একা ফিরব

প্যারিস

নির্যাতন-চক্র ফাঁসিকাঠ আর একমাত্র টাওয়ারের নগরী

প্যারিস, ১৯১৩

পুষ্কর দাশগুপ্ত

আকাশ আর সমুদ্রের চেয়ে তুমি সুন্দর

যখন তুমি ভালোবাসো তখন উচিত বিদায় নেওয়া
ছেড়ে যাও তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে যাও তোমার বাচ্চাকে
ছেড়ে যাও তোমার বন্ধুকে ছেড়ে যাও তোমার বান্ধবীকে
ছেড়ে যাও তোমার প্রেমিকাকে ছেড়ে যাও তোমার প্রেমিককে
যখন তুমি ভালোবাসো তখন উচিত বিদায় নেওয়া

জগৎসংসার নিগ্রো পুরুষ আর নিগ্রো রমণীতে ঠাসা
নারী পুরুষ পুরুষ নারী
তাকিয়ে দেখ সুন্দর দোকানগুলি
ঐ ছ্যাকড়া গাড়ি ঐ পুরুষটি ঐ নারীটি ঐ ছ্যাকড়া গাড়ি
আর যত সব সুন্দর পসরা

রয়েছে শূন্য রয়েছে বাতাস
পর্বত জল আকাশ পৃথিবী
শিশুরা জীবজন্তু
গাছপালা আর পাথুরে কয়লা

বেচতে কিনতে ফের বেচতে শেখো
দাও নাও দাও নাও
যখন তুমি ভালোবাসো জানা উচিত
গান গাওয়া ছোটা খাওয়া পান করা
শিস দেওয়া
আর কাজ করতে শেখা

যখন তুমি ভালোবাসো তখন উচিত বিদায় নেওয়া
স্মিত হাসি হাসতে হাসতে চোখের জল ফেলো না
দুটি স্তনের মাঝখানে বাসা বেঁধো না
নিঃশ্বাস নাও হাঁটো বিদায় নাও চলে যাও

আমি স্নান করি আর আমি তাকিয়ে থাকি

আমি দেখি আমার চেনা মুখখানি
হাত পা চোখ
আমি স্নান করি আর তাকিয়ে থাকি

গোটা জগৎটা চিরকাল রয়েছে
অবাক করা জিনিসে ভর্তি জীবন
ওষুধের দোকান থেকে আমি বেরোই
ওজন করার যন্ত্রের ওপর থেকে সন্থ নেমে আসি
আমি আমার ৮০ কিলো ওজনটা দেখে নিই
আমি তোমায় ভালোবাসি

পুষ্কর দাশগুপ্ত

চিঠি

তুমি আমায় বলেছ আমায় যদি চিঠি লেখো
সবটা টাইপ কোরো না
নিজের হাতে যোগ করে দিও একটা লাইন
একটা শব্দ কিছুই না আহা বিশেষ কিছুই নয়
হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

তবুও আমার রেমিংটনটা সুন্দর
ওটাকে আমি খুবই ভালোবাসি আর বেশ কাজ করি
আমার লেখা গোটা গোটা আর পরিষ্কার
দেখে বেশ বোঝা যায় আমিই তা টাইপ করেছি

কিছু শূন্যস্থান থাকে যা আমিই এক রাখতে জানি
তাহলে আমার পৃষ্ঠার যে চোখ আছে তা দেখো
তবু তোমায় খুশি করার জন্য আমি কালিতে যোগ করে দিই
দু তিনটে শব্দ
আর মোটা একটা কালির দাগ
যাতে করে শব্দগুলো তুমি পড়তে না পারো।

পুষ্কর দাশগুপ্ত

লেখা

আমার টাইপমেশিনটা তালে তালে চলতে থাকে
প্রতিটি পংক্তির শেষে সে বেজে ওঠে
রোলাবের মাথার দাঁতওয়ালা চাকতিগুলি ঘর্‌ঘর্‌ আওয়াজ তোলে
মাঝে মাঝে আমি বেতের আরাম কেদারায় এলিয়ে পড়ে
একরাশ ধোঁয়া ছাড়ি
আমার সিগারেট সারাক্ষণ জ্বলতে থাকে
আমি তখন ঢেউয়ের শব্দ শুনতে পাই
বেসিনের পাইপে গলা টেপা জলের গর্‌গর্‌ শব্দ
আমি উঠে দাঁড়াই আর ঠাণ্ডা জলে আমার হাত ভিজিয়ে নিই
কিংবা গায়ে আতর লাগাই
লেখার সময় নিজেকে না দেখার জন্য কাচওয়ালা আলমারির
আয়নাটা আমি ঢেকে দিয়েছি
জাহাজের গোল ফোকরটা একটা রোদের চাকতি
যখন আমি চিন্তা করি
সেটা তখন ঢোলের চামড়ার মত বেজে ওঠে আর জোরে জোরে কথা বলে

পুষ্কর দাশগুপ্ত

আমি তো কথাটা বলেছিলাম

আমি কথাটা বলেছিলাম
বানর কিনতে গেলে
যেগুলো বেশ ছটফটে আর তোমাদের প্রায়
ভয় পাইয়ে দেয় ওগুলোই নিতে হয়
আর তোমাদের বুকের ভেতর লেপ্টে থাকা ঘুমিয়ে পড়া শান্তশিষ্ট
কোন বানর কক্ষনো বাছতে নেই
কারণ ওগুলো আফিং খাওয়ানো বানর যারা পরদিন
হিংস্র হয়ে ওঠে
এটাই ঘটেছিল একটা কমবয়সী মেয়ের ও নাকে কামড় খেয়েছিল

পুষ্কর দাশগুপ্ত

হাসা

আমি হাসছি

আমি হাসছি
তুমি হাসছো
আমরা হাসছি
এই হাসি বাদে কেবল আমাদের ভালোবাসা
আর কিছুরই প্রয়োজন নেই
নির্বোধ আর খুশি হতে জানা চাই

পুষ্কর দাশগুপ্ত

দ্বীপ

দ্বীপ
দ্বীপ
দ্বীপ যেখানে কেউ কোনদিন নৌকো ভেড়াবে না
দ্বীপ যেখানে কেউ কোনদিন নামবে না
দ্বীপ গাছপালায় ঢাকা
দ্বীপ বাঘের মতো ওঁৎ পেতে থাকা
দ্বীপ নিস্তব্ধ
দ্বীপ নিথর
দ্বীপ অবিস্মরণীয় আর পরিচয়হীন
জাহাজ থেকে আমার জুতোগুলি ছুঁড়ে দিই কেননা আমি
তোমাদের কাছে যেতে চাই

পুষ্কর দাশগুপ্ত

কেন আমি লিখি

কেননা—·

পুষ্কর দাশগুপ্ত



অঁরি মিশোর কবিতা

POEMES DE HENRI MICHAUX

অঁরি মিশো

এক দূর দেশ থেকে আমি লিখছি

১

মেয়েটি জানায় : আমাদের এখানে মাসে মাত্র একবার সূর্য ওঠে, তাও অল্প সময়ের জন্যে। লোকে কিছুদিন আগেই চোখ রগড়ায়, কিন্তু বৃথা। সময় একেবারে অনমনীয়। সূর্য তার যথানির্দিষ্ট মুহূর্তেই আসে।

অতঃপর, যতক্ষণ আলো থাকে ততক্ষণ করবার থাকে একগাদা কাজ, ফলে নিজের দিকে একটু চেয়ে দেখবার অবসর পাওয়াই যায় না প্রায়।

রাত্তিরে আমাদের ঝঞ্ঝাট বাধে যখন কাজ করতে হয়, কাজ তো করতেই হয় : তখন অনবরত বামন জন্মাতে থাকে।

২

তাকে মেয়েটি আরও বলে : পাড়াগাঁয় কেউ যখন হাঁটে তখন তার সামনে খাড়া হয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাঙ। সেগুলো সব পাহাড। শীগ্‌গির হোক আর দেরিতে হোক, হাঁটু মোড়া শুরু করতে হয়। প্রতিরোধে কোন ফল হয় না, আর অগ্রসর হওয়াই যায় না, এমনকি নিজেকে জখম ক'রেও।

আমি একথা আঘাত দেবার জন্যে বলছি না। আমি যদি সত্যি আঘাত দিতে চাইতাম তাহলে অন্য অনেক কিছুর বিষয়ে বলতে পারতাম।

৩

তাকে সে আরও জানায় : এখানকার ভোরবেলাটা ধূসর। এরকম বরাবর ছিল না। কাকে দোষ দেব জানিনা।

রাত্তিরে পোষা গোরুভেড়া জোর ডাকতে থাকে, সে-ডাক শেষের দিকে দীর্ঘ আর তীব্র হ'য়ে যায়। করুণা হয়, কিন্তু কি করা যাবে ?

ইউক্যালিপ্‌টাসের গন্ধ আমাদের ঘেরে : মঙ্গল, প্রশান্তি ; কিন্তু তা সব কিছু থেকে বাঁচাতে পারে না, নাকি তুমি মনে করো তা সব কিছু থেকে সত্যি বাঁচাতে পারে ?

৪

আমি আর একটা কথা যোগ করছি, বরং বলা যায় একটা প্রশ্ন।

তোমাদের দেশেও কি জল বয়? (তুমি আমাকে তা বলেছো কিনা আমার মনে নেই) এবং শিহরনও জাগায়, ঠিক সেই জলই কিনা।

আমি কি তাকে ভালোবাসি? জানি না। যখন সে শীতল থাকে তখন তার ভিতরে নিজেকে এমন একলা মনে হয় কিন্তু সে যখন উষ্ণ থাকে তখন সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। তাহলে? কি ক'রে বিচার করা যাবে? তোমরা যখন অকপটে মন খুলে তার সম্বন্ধে আলোচনা করো তখন কি করে বিচার করো আমায় বলো।

৫

আমি পৃথিবীর শেষ সীমা থেকে তোমায় লিখছি। তোমার তা জানা দরকার। গাছরা প্রায়ই কাঁপে। পাতাগুলো লোকে কুড়িয়ে নেয়। তাদের কত যে শিরা তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাতে কি লাভ? গাছের সঙ্গে তাদের আর কোনো সম্বন্ধ থাকে না, ফলে আমরা বিব্রত হ'য়ে স'রে পড়ি।

পৃথিবীর জীবনযাত্রা কি হাওয়া ছাড়া চলে না? না কি সব কিছুকে কাঁপ-তেই হবে সব সময়, সব সময়?

মাটির নিচেও নড়াচড়া আছে, আর বাড়ির মধ্যে আছে বুঝি ক্রোধ, যা তোমার সামনে এগিয়ে আসে, যেন কড়া মেজাজের কেউ তোমার স্বীকারোক্তি আদায় করতে চায়।

যা না দেখলেও চলে তা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। কিছুই না। তবু সবাই কাঁপে। কেন?

৬

আমরা সবাই এখানে বাস করি দারুণ উদ্বেগের মধ্যে। জানো কি আমি যদিও এখন খুব অল্পবয়সী আগে আরও অল্পবয়সী ছিলাম। আমার সাথী-রাও তাই ছিল। এর মানে কি? নিশ্চয় এর তাৎপর্য ভয়ঙ্কর।

এবং আগে, যেমন তোমাকে ইতিপূর্বে বলেছি, আমরা যখন আরও অল্প-বয়সী ছিলাম তখন আমাদের ভয় করত। আমাদের বিভ্রান্তির সুযোগ নেওয়া হত। আমাদের হয়তো বলা হত: "এই তো, এখন তোমাদের কবর দেওয়া

হবে। তার সময় এসে গেছে।" আমরা ভাবতাম: "কথাটা সত্যি, আজ রাতেও আমাদের কবর দেওয়া হতে পারে, যদি বোঝা যায় তার সময় এসে গেছে।"

এবং আমরা বেশি দৌড়াতেও সাহস করতাম না: দৌড়ে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এক তৈরি-রাখা গহ্বরের সামনে পৌঁছোনো এবং একটা কথা বলবারও সময় না থাকা, দম না.থাকা।

বলো তো এ কথাব রহস্যটা কি?

৭

তাকে সে আরও জানায়: গাঁয়ে সব সময় সিংহদের দেখা যায়, তারা নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়ায়। তাদের দিকে নজর না দিলে তারা আমাদের দিকে নজর দেয় না।

কিন্তু তাদের সামনে কোন তরুণীকে যদি দৌড়তে দেখে, তাহলে তারা তার বিহ্বলতা ক্ষমা করতে চায় না। না। তারা তক্ষুনি তাকে খেয়ে ফেলে।

এই কারণে তাবা সব সময় গাঁয়েব মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে তাদের কিছু করবার নেই, কেননা তারা যে অন্যত্রও এমনি হাই তুলবে, এটা কি স্পষ্ট নয়?

৮

তাকে সে একান্তে জানায়: বহু বহু কাল ধ'রে আমরা সমুদ্রের সঙ্গে বিতণ্ডা ক'রে আসছি।

খুব কচিৎ কখনো তার নীল রঙ এবং শান্ত ভাব দেখে তাকে খুশি মনে হয়। কিন্তু তা বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। তাছাড়া, তার গন্ধই তা ব'লে দেয়, এক পচা গন্ধ (অবিশ্যি তা তাব তিক্ততাও হতে পারে)।

এখানে ঢেউয়ের ব্যাপারটা আমার ব্যাখ্যা করা উচিত। সে এক দারুণ জটিল ব্যাপার, এবং সমুদ্র···আমি তোমাকে অনুরোধ করছি আমাকে বিশ্বাস করো। আমি কি তোমাকে ঠকাতে চাইব? সে শুধু একটা কথা নয়, শুধু একটা ভয় নয়। আমি তোমাকে শপথ ক'রে বলছি সে আছে; তাকে লোকে দেখে সব সময়।

কে? আমরা, আমরা তাকে দেখি। সে অনেক দূর থেকে আসে আমাদের সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া বাধাবার জন্যে, আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে।

তুমি যখন আসবে তখন নিজেই তাকে দেখতে পাবে, তুমি একেবারে অবাক হ'য়ে যাবে। "আরে!"—তুমি ব'লে উঠবে, কেননা সে বিমূঢ় করে দেয়।

আমরা একসঙ্গে তাকে দেখব। আমি নিশ্চিন্ত যে, আমার আর ভয় করবে না। বলো, তা কি কখনো ঘটবে না?

৯

সে বলে যায়: কোন সন্দেহ, কোন অনাস্থা আমি তোমার মনে থাকতে দিতে পারি না। তোমাকে সমুদ্রের কথা আমি আবার বলতে চাই। কিন্তু বিমূঢ় হওয়ার অবস্থাটা রয়েইছে। স্রোতস্বিনীগুলো এগোয় কিন্তু সে এগোয় না। শোনো, রাগ করো না, আমি শপথ ক'রে বলছি তোমাকে আমি ঠকাতে চাইছি না। সে ঐ রকমই। যতই উথালপাথাল সে করুক না কেন, অল্প একটু বালির সামনে সে থেমে পড়ে। তার মতো কেউ বিমূঢ় বোধ করে না। সে নিশ্চয় অগ্রসর হতে চায়, কিন্তু যা ঘটে তা ঐ।

পরে কোন দিন হয়তো সে এগোবে।

১০

তার চিঠিতে লেখা; "পিঁপড়েরা আমাদের আগের চেয়ে আরও বেশি ঘেরাও ক'রে আছে।" তারা উদ্বিগ্নভাবে মাটিতে পেট ঠেকিয়ে ধুলো ঠেলে। আমাদের সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ তাদের নেই।

একটা পিঁপড়েও মাথা তোলে না।

সবচেয়ে বদ্ধ সমাজ ওদের, যদিও ওরা অবিরাম বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে কিছু আসে যায় না, ওদের নানাপরিকল্পনা থাকে পূরণ করবার, একাগ্র-ভাবে নানা কাজ করবার থাকে···ওরা নিজেদের নিয়েই আছে···সর্বত্র।

এবং আজ পর্যন্ত একটিও আমাদের দিকে মাথা তোলেনি। বরং ওরা পিষ্ট হ'য়ে যাবে তাও সই।

১১

সে তাকে আরও লেখে:

"আকাশে যে কি সব আছে তা তুমি কল্পনা করতে পারো না, দেখলে

তবে বিশ্বাস হবে। যেমন, ধরো, ঐ···কিন্তু সেগুলোর নাম তোমাকে এক্ষুনি আমি বলব না।"

যদিও দেখলে মনে হয় সেগুলো খুব ভারী এবং প্রায় সারা আকাশটা জুড়ে আছে, তবু তাদের ওজন নেই যতই বড় হোক না কেন, নবজাত শিশু যেমন।

আমরা তাদের বলি মেঘ।

এটা সত্যি যে, তাদের ভিতব থেকে জল বেরোয়, কিন্তু তাদের চিপে নয়, চূর্ণ ক'রে নয়। এত কম জল ওাদের থাকে যে সেরকম করা বৃথা।

কিন্তু অনেক অনেক দৈর্ঘ্য, অনেক অনেক প্রস্থ এবং গভীরতাও, অনেক গভীরতা জুড়ে যদি তারা থাকে এবং যদি ফুলতে ফাঁপতে পারে, তাহলে শেষ পযস্ত কয়েক ফোঁটা জল, হ্যাঁ জল, তারা ঝরাতে পারে। এবং তাতেই লোকে একেবারে ভিজে যায়। তাদের নাগালেব মধ্যে গিয়ে পড়ায় লোকে রেগে কাঁই হ'য়ে পালায়; কেননা তারা ঠিক কোন্ মুহূর্তে তাদের ফোঁটাগুলো ঝবাবে কেউ জানে না; কখনো কখনো তারা দিনের পব দিন তাদের ফোঁটা ঝরায় না। বাড়ি ব'সে তার জন্যে অপেক্ষা করলে তা বৃথা হবে।

১২

শিহরন সম্বন্ধে ভালোভাবে শিক্ষা এদেশে দেওয়া হয় না। আমরা আসল নিয়মকানুনগুলো জানি না, ফলে ঘটনাটা যখন ঘটে আমবা তার জন্যে মোটেই প্রস্তুত থাকি না।

ব্যাপাবটা হল সময়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। (তোমাদের দেশেও কি তা এইরকম?) তার আগেই এসে পৌছনো দরকার; বুঝেছো আমি কি বলতে চাইছি, সামান্য খুব সামান্য আগে। দেরাজের মধ্যে উকুনের গল্পটা কি তুমি জানো? হ্যাঁ, নিশ্চয়। গল্পটা খুব সত্যি, তাই না? আমি আর কি বলব জানি না। কবে আমাদের দেখা হবে?

অরুণ মিত্র

কাউকে না ঠেঙিয়ে বড় একটা তার দিকে তাকাতে পারি না। মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব অনেকের পছন্দ : আমার ? কখনো না। আমি ঠেঙাতেই চাই।

রেস্তোরাঁয় কেউ কেউ আমার সামনে চুপচাপ বসে, কিছুক্ষণ থাকে, কেননা তারা খেতেই এসেছে।

এই যে, একজন।

এই ওকে কব্জা করলাম ; খপ্।

এই ফের কব্জা করলাম, খপ্।

এইবার ওকে পোশাকের 'হুক'-এ ঝোলালাম।

এবার হুক থেকে নামালাম।

ফের ঝোলালাম।

আবার ওকে নামালাম।

টেবিলে রাখলাম, চট্‌কালাম, শ্বাসরোধ করলাম।

কলঙ্কিত ক'রে জলে চোবালাম।

ও বেঁচে উঠলো।

ওকে সাফ্ করলাম, টেনে সোজা করলাম (ক্রমে উত্তেজিত হতে লাগলাম এর তো একটা শেষ করতে হবে), ওকে দললাম, ওকে পিষলাম, ওকে তাল পাকালাম আর গেলাসে ঢুকিয়ে দিলাম এবং বেশ ঝাঁকিয়ে ভেতরের জিনিসটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেললাম, ছোকরাটাকে বললাম : "এর চেয়ে একটা পরিষ্কার গেলাস দাও তো।"

কিন্তু কেমন অস্বস্তি বোধ করলাম, তাড়াতাড়ি হিসেব চুকিয়ে তাই সরে পড়লাম।

নন্দদুলাল দে

আমার রাত্রিতে, আমার রাজাকে আমি অবরুদ্ধ করি, আমি ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াই ও তাঁর ঘাডটা মটকাই।

উনি শক্তি সঞ্চয় করেন, আমি ফিরে আসি ওঁর উপর পডতে, এবং আরো একবার ওঁর ঘাডটা মটকাই।

ওঁকে ধরে নাড়া দিই, জোরে-জোরে ওঁকে নাডাই কোনো বৃদ্ধ ভঙ্গুর লতার মতো, ওঁব মাথায় মুকুটটা কাঁপতে থাকে।

তবু, উনি আমার রাজা, যেটা আমি জানি এবং উনি নিজেও জানেন, এবং আমি ওঁর আজ্ঞাধীনই, নিশ্চয়।

তা সত্ত্বেও, রাত্রিতে, আমার দুই হাতের আবেগ ওঁর টুঁটি টিপে ধবে অবিরাম। একটুও ভীত নই, ঢুকি খালি হাতে, এবং ওঁর সেই রাজকীয় ঘাড়ে মোচড় দিই।

এবং উনি আমার রাজা, যাঁব টুঁটিটা আমাব ছোট ঘরের নিভৃতে আমি কত-না দিন ধরে বৃথাই টিপে ধবছি; ওঁর মুখটা প্রথমে ফেকাসে হয়, অল্প পরেই আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, এবং উনি মাথাটা তোলেন আবার, প্রতি রাত্রে, প্রতি বাত্রেই।

আমার ছোট ঘরের নিভৃতে, আমার রাজার সেই মুখে আমি পাদি। পরে হাসিতে ফেটে পড়ি। উনি চেষ্টা করেন কপালের সৌম্য ভাবটা বজায় রাখতে, সব অপমান থেকে মুক্ত থাকতে। কিন্তু, শুধু যখন ওঁর দিকে ঘুরে দাঁডাই, একমাত্র তখন ছাডা আমি সমানে পেদেই চলি ওঁর মুখে, এবং হাসিতে ফেটে পড়তে থাকি, ওঁর সেই সম্রান্ত বদনের সামনে, যখন উনিও চেষ্টা চালিয়ে যান নিজেব মহিমাটা অক্ষুণ্ণ রাখতে।

এইভাবেই ওঁর সঙ্গে চলে আমার ব্যবহার; আমার অখ্যাত জীবনে সেই এক অন্তহীন আরম্ভ।

এবং এবার এই ওঁকে মাটিতে ফেলে দিলাম, পরে চেপে বসছি ওঁর মুখের উপর—ওঁর মহামহিম মুখখানি ঢাকা পড়ে যায়। তখন তেলের দাগধরা আমার অভব্য প্যান্টটা, এবং আমার পাছাটা—যেহেতু জায়গাটাব নামটাই এই—এ-দুটো খাসা বসে থাকে ঐ যে-মুখ তৈরি হয়েছে রাজত্ব করার জন্য, সেই মুখখানির উপর।

এবং যখন খুশিমতো বা খুশিরও বাইরে বাঁয়ে-ডাইনে ঘুরতে-ফিরতে এতটুকু অস্বস্তি-বোধ নেই আমার, একেবারেই নেই, তখন একবার ভুলেও ভাবি না ওঁর নাক বা চোখ-দুটোর কথা যা হয়তো পড়ে যেতে পারে আমার পথে। বসে থাকতে-থাকতে অরুচি যখন ধরে, একমাত্র তখনই আমি উঠে বেরিয়ে যাই।

আর ফিরি যদি, দেখি ওঁর অবিচল মুখখানি সমানই বিরাজমান, সবসময়।

ওঁকে চড় মারি, থাপ্পড় কষাই, পরে বিদ্রূপের ভাবে বাচ্চা ছেলের মতো ওঁর নাকটা ধরে ঝেড়ে দিই।

অবশ্য এত সত্ত্বেও এটা পরিষ্কার যে উনিই হলেন রাজা, এবং আমি ওঁর প্রজা, ওঁর সবেধন-নীলমণি প্রজা।

পোঁদে লাথি মেরে ওঁকে আমার ঘর থেকে তাড়াই। ওঁকে ঢাকি কুটনোর খোসায়, আবর্জনায়। ওঁর ঠ্যাঙে আছাড় মেরে বাসন ভাঙি। ওঁর কান-দুটো ভরে তুলি জঘন্য চোখা-চোখা অপমানের বুলিতে, যাতে ওঁকে অবশেষে নাড়াতে পারি যেমন গভীরভাবে তেমনি লজ্জায়—দুর্মুখদের সেবার যোগ্য সেই কুৎসার সারি, যত নোংরা তত লম্বা তার খুঁটিনাটিতে, যাকে উচ্চারণ করা মানেই এমন এক জঞ্জালে পড়া যার থেকে রেহাই আর নেই, শরীরের মাপে তৈরী সেই কদাকার জামা: অস্তিত্বের মলমূত্রই বটে।

যাই হোক, পরদিন আমায় ফের শুরু করতে হয়।

উনি ফিরে এসেছেন, ঐ রয়েছেন। সবসময় রয়েছেন। পিটটান যে দেবেন চিরকালের মতো, তা সম্ভব নয় ওঁর পক্ষে। না, এইটুকু এই ঘরে ওঁর ঐ হতচ্ছাড়া রাজকীয় উপস্থিতিটা আমার ঘাড়ে না চাপালেই ওঁর নয়।

মামলা-মকদ্দমায় আমায় প্রায়ই জড়িয়ে পড়তে হয়। টাকা ধার করি, বা ঝগড়ার সময় ছোরা বার করে বসলাম, কি ছোট ছেলেপিলে দেখলাম তো তাদের ওপর অত্যাচার করলাম—কি করি, নাচার আমি—আইনের মাথামুণ্ডু আমার বোঝা হল না।

প্রতিপক্ষ যখন আদালতে তার নালিশ যথাযথ পেশ করেছে, আমার যুক্তিতে কান না দিয়ে রাজা আমার সেই প্রতিপক্ষেরই ওকালতি সমর্থন করতে বসেন, যেটা তাঁর ঐ মহামহিম মুখে হয়ে দাঁড়ায় অভিশংসনই, যে-রায় আমার ঘাড়ে পড়ল বলে, তারই ভয়াবহ গৌরচন্দ্রিকা।

শুধু শেষের দিকে, কয়েকটি তুচ্ছ সীমা তিনি বেঁধে দিলেন।

প্রতিপক্ষ যখন দেখে, এ সীমায় তার কিছু যায়-আসে না এবং ব্যাপার-টাতে আদালতেরও সায় নেই, সে তখন তার নালিশের ঐ গৌণ অংশগুলি প্রত্যাহার করে নিতে প্রস্তুত—বাকী অংশগুলিতে তো সে সমর্থন পাচ্ছে, তা-ই তার যথেষ্ট।

এমন সময় রাজা আমার আবার গোড়া থেকে সুরু করলেন তাঁর যুক্তি-প্রদর্শন, সবসময় ভাবটা যেন এটা পুরোপুরি তাঁর নিজেরই যুক্তি, শুধু সামান্য ছাঁট-কাট দিয়ে একটু সংক্ষিপ্ত করলেন তাঁর বক্তব্য। যেই শেষ হয়েছে, পদে-পদে যুক্তির ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে আবার সুরু করলেন তিনি একই বিচার, গোড়া থেকেই, এবং এইভাবে এক বার হতে অন্য বারে তাঁর সেই বিচারকে পর্বে-পর্বে একটু-একটু খর্ব করতে-করতে শেষে এমন অর্থহীনতায় পর্যবসিত করে ছাড়লেন যে লজ্জায় অধোবদন আদালত ও দর-ভর্তি বিচারকদের সেই দল ভাবতে সুরু করল হেন তুচ্ছ ব্যাপারে কী করে তারা আহূত হতে পারে, এবং তাই উপস্থিত সকলের হাসি-ঠাট্টা-টিটকিরির মধ্যে এক নাস্তিবাচক রায় দেওয়া হল।

পরে আমার কথা এতটুকু না ভেবে, যেন এ-ব্যাপারে আমি ধর্তব্যের মধ্যেই নেই এমন ভাব দেখিয়ে, রাজা আমার উঠে দাঁড়ালেন ও বেরিয়ে চলে গেলেন, তাঁর মুখ দেখে কার সাধ্য বোঝে কী ভাবছেন তিনি!

এমন কর্ম কি কোনো রাজায় সাজে, এ-প্রশ্ন করা চলে ; যদিও এর দ্বারাই তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন আসলে তিনি কী—এক স্বেচ্ছাচারী উৎপীড়কই, যিনি নিজের নিদারুণ মন্ত্রবলের অমোঘ ও বিশ-মণী চাপটাকে শুধু জাহির করবেন, এবং সেটা ভিন্ন কিছুই, একেবারে কিছুই কাউকে করতে দেবেন না।

গাধার হদ্দ আমি, ভাবছিলাম ওঁকে ঘাড় ধরে বার করে দেব! ওঁকে নিয়ে মাথাটা না ঘামিয়ে ঘরে ওঁকে চুপচাপ, শুধু নিজের খুশীমতো চুপচাপ ছেড়ে দিলাম না কেন!

না, তা তো হবার নয়। গাধা যে আমি, এবং যে-মুহূর্তে উনিও দেখলেন বা রে, রাজত্ব করা এত সোজা, অমনি গোটা দেশটার উপরই তাঁর যথেচ্ছ প্রভুত্ব বিস্তার করতে চাইলেন।

যেখানেই যান, উনি গ্যাঁট হয়ে বসেন।

এবং লোকে এতটুকু আশ্চর্য হয় না, যেন ওঁর ঐ স্থানটি নির্দিষ্ট ছিল

চিরকাল ধরে।

কেউ রা'টি কাড়ে না আর, সকলেই কাল শুনছে—সকলেরই অপেক্ষা, এখন সিদ্ধান্ত যা-কিছু, তা উনিই নেবেন।

আমার ছোট ঘরে আসে যায় জন্তু জানোয়ার। সব একসঙ্গে নয়। সব অবিকলও নয়। তবু তারা আসছে-যাচ্ছে, প্রকৃতির নানান আকারের এক হীন দশার ও হাস্যকর মিছিল। ঐ ঢুকছে সিংহ, মাথা নিচু, জীর্ণ কাপড়ের বস্তার মতো সারাটা গা কুঞ্চিত, এখানে-ওখানে ঠোকর খাওয়া। ওর থাবাগুলো দেখে কষ্ট হয়, যেন হাওয়ায় ভাসছে। কী করে সে এগোচ্ছে কে জানে কিন্তু এগোচ্ছে হতভাগ্যেরই মতো।

হাতী যেটা ঢুকছে, সেটাও যেন চুপসে গেছে, বাচ্চা হরিণের থেকেও জোর তার কম।

এইরকমই অন্যান্য জন্তুরা।

কোনো কল নয়, যন্ত্রপাতি নয়। মোটরগাড়ি ঢুকছে, তাও শুধু সূক্ষ্ম পাত একখানি, যা দিয়ে বড় জোর তক্তার মেঝে বানানো যায়।

এমনই আমার ছোট ঘরখানি, যেখানে আমার গোঁয়ার রাজামশাই হেন কোনো জিনিসই কিছুতে কখনো চাইবেন না যা তিনি নিজে ভুল পথে না চালিয়েছেন বা গোল পাকিয়ে না ছেড়েছেন বা শূন্যতায় পর্যবসিত না করেছেন, তবু সেই একই যে-ঘরে সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার জন্য আমি ডাক দিয়েছি কতনা প্রাণীদের।

এমন-কি বর্বরের চূড়ান্ত যে-গণ্ডার, যে মানুষ সহ্য করতে পারে না, গুঁতো মেরে সটাং হাজির হয় যে-কোনো জায়গায় (আর কী কঠিন গা, একেবারে পাথরে খোদিত), সেই গণ্ডার পর্যন্ত একদিন প্রায় স্পর্শাতীত এক কুয়াশার মতো ঢুকে পড়ে, পালাতে ব্যস্ত, শরীরে জোর নেই…এবং হাওয়ায় ভাসতে থাকে।

ওর চেয়ে একশো গুণ বেশি শক্ত ছিল গবাক্ষের পুঁচকে পর্দাটি—একশো গুণ বেশি শক্ত ঐ প্রবল প্রচণ্ড গণ্ডারের চেয়েও, যে নাকি যা-কিছুরই সামনে পড়ুক, কখনো পিছিয়ে আসে না।

কিন্তু গণ্ডার যদি ঢোকে তো ঢুকবে একমাত্র দুর্বল হয়েই, জলের ক্ষীণ টপ-

পট ফোঁটার মতো, এইরকমই চেয়েছেন আমার রাজা।

ওকে হয়তো হাঁটার জন্য ভবিষ্যতে একদিন খঞ্জের যষ্টিই দেবেন…এবং ওকে বাগে আনতে চর্মের মতো কোনো বস্তুও, ছোট ছেলেব এক পাতলা গায়ের চামড়া, যা ছড়ে যাবে বালুকণাব ঘষ্টানিতে।

জন্তু-জানোয়াব যা-কিছু যাবে আমাদেব সামনে দিয়ে, তারা একমাত্র এইভাবেই যাবে অন্য কোনো ভাবে নয়, এমনই হুকুম আমাব রাজার।

প্রভু উনি ; আমি ওর হাতেব মুঠোয় ; মজা কববেন, এমন প্রবৃত্তি তাঁর নেই।

এই ছোট্ট শক্ত হাতটুকু আমার পকেটে, এ ছাড়া আমাব সেই বাগ্দত্তা প্রিয়ার আব কিছুই নেই আমাব কাছে।

ছোট্ট হাতটি খটখটে শুকনো ও মমিতে পবিণত (এ ছিল সত্যিই সেই প্রিয়ারই হাত একদিন, এও কি সম্ভব ?)। আমাব সেই প্রিযাব আর কিছুই রাখতে দেননি রাজা।

তাকে উনি কেড়ে নিযেছেন। ওঁবই জন্য আমি হারিয়েছি তাকে। উনি তাকেও আজ আমার কাছে শূন্যতায় পর্যবসিত করে ছেড়েছেন।

আমাব ছোট ঘবে, প্রাসাদেব একটাব-পর একটা এই অধিবেশনগুলো দুর্দশারই অবশেষ।

সাপগুলো পর্যন্ত ওঁব পক্ষে যথেষ্ট নিচু নয়, যেমনটি উনি চান তেমন হামাগুড়ি দিয়ে তাবা গড়িয়ে-গড়িয়ে চলে না, এমন-কি পাইন গাছ একটা, যা নড়ে না চড়ে না, তাও ওঁকে চটিয়ে ছাড়বে।

তাই যা-কিছু এসে হাজিব হয় তাঁব দরবাবে (আমাদের এই নগণ্য ছোট্ট ঘরে !), তাব সবই এত অবিশ্বাস্যভাবে হতাশাব্যঞ্জক যে ছোটলোকেব থেকেও ছোটলোক তাকে নিয়ে কখনো ঈর্ষান্বিত হবে না।

তাছাড়া এক ঐ আমার বাজা ও এসবে অভ্যস্ত এই আমি ছাড়া আর কে এমন কোথায় আছে যে খুঁজে পাবে প্রাণীব মতো কোনো প্রাণী একটা, এই একের-পর-এক অখ্যাত পদার্থের ক্রমাগত এগোনো ও পিছু হটায়, ঝরা পাতার এই তুচ্ছ তিড়িং-বিড়িং নাচে, জলের এই দুটি একটি ফোঁটায যা নীরবতার বুকে পড়ে যেমন কঠিন তেমনি বিষণ্নভাবে।

এসব অবশ্য ব্যর্থ প্রশস্তি বই নয় !
অবোধ্য তাঁর মুখের গতিবিধি, সত্যিই অবোধ্য।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

এরাঁগোঁরা
রীতিনীতি

জানালা ওরা ভালবাসে না, তাতে স্পষ্ট না দেখা গেল তো না-ই গেল, অন্তত নিজের বাড়িতে নিজের মতন করে থাকতে তো পারবে। কিন্তু যেহেতু তারা অতীব ভদ্র এবং আচরণও কবতে চায় জানালা ব্যবহারে অভ্যস্ত দেশের লোকেদেরই মতো—তাছাড়া জানালা না থাকলে পাছে ঘরটা ন্যাংটো-ন্যাংটো দেখায়, বা একঘেয়ে ঠেকে কিংবা মনে হয় যেন রেগে-মেগে রয়েছে, ও তাই অযথা পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, এর-ওর যা-তা ভাবা, এদিকে নিজেরা যখন এরা শান্তি ও সৌম্যতার প্রতিমূর্তি বই নয়—তাই এরাও বাড়িতে জানালা বেখেছে, এমন-কি অতিরিক্ত ভাবেই রেখেছে। কিন্তু সব জানালাই আসলে কপট, খোলা একটিও যাবে না, এমন-কি আগুন লাগলে টপকে পালানোর উপায় পর্যন্ত নেই। তবু মিথ্যা হয়েও ছাযাতে-প্রতিচ্ছায়াতে অনুকরণটি এত নিখুঁত যে সেই জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকেই আনন্দ, ওগুলি সত্য নয় জেনেও, বিশেষত যদি দিনের সময়টা আর রোদের জোরটা মোটামুটি মিলতে পারে ভ্রমটাকে যথাযথ জঁাকাতে।

রয়েছে এমন-কি আধ-খোলা কত জানালাও, ঐ অবস্থায় চিরকাল ধরে, রাত্রি-দিন, তা কনকনে শীতে হোক কি কুয়াশায় হোক, বা বর্ষায় কি প্রবল তুষার-পাতেই হোক, কেবল তা দিয়ে কিছু না পারে ঢুকতে না পারে বেরোতে, অনেকটা যেন ধনীদের ওপর-ওপর বদান্যতার ক্রুর অনুরূপ।

সত্যিকারের জানালা যা কোনদিন খুলতে পারে, তার চিন্তাতেই এদের গা ঘুলিয়ে ওঠে। সেটা ভাবা মানেই যেন ঐ বুঝি ডিঙোল কেউ রেলিং, ঢুকে পড়ল ঘরে, এবং তখন আর ঠেকানো যাচ্ছে না এমন রবাহুতদের সারির ছবি ঘনিয়ে ওঠে ওদের ভীত-বিহ্বল চোখে।

আক্রান্ত হলে বহু শান্তশিষ্ট ব্যক্তিও যেমন হিংসাত্মক ও মন্দ হয়ে ওঠে,

তেমনি জানালার কথা এদের কাছে পেড়েছ কি সর্বনাশ, এবং খোলা যায় এমন একটিও জানালা যদি তোমাদের থাকে তো নিজেদের বাড়িতে এদের কাউকে ভুলেও তোমরা ডাকতে যেও না, তা সে-জানালা তোমাদের বন্ধই থাকুক, কোনো বাধার চাপে আটকানো থাক, বা ব্যবহারের অযোগ্য হোক, কিংবা হোক-না সে-জানালা কোন গুদম-ঘরেরই। এমন কিছু করে যদি বসো তো এদের কেউই তোমাদের কখনো ক্ষমা করবে না।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

গোররা

ওরা ধর্ম-পিপাসু। ধর্মের জন্য কী ত্যাগ স্বীকার না তারা করেছে? বর্বর আচার অনুযায়ী তারা খাবার রান্না করে না। কেবলমাত্র দেবতাদের ভাগ্যে জোটে রান্না-করা খাদ্য। এ খাদ্য তারা বানায় খুব যত্ন করে। একজন পাকা রাঁধুনি সর্বক্ষণ আস্ত ভেড়া, হাঁস, প্রভৃতি সেদ্ধ করার কাজে ব্যস্ত থাকে।

গোরদের দরাজ দিল (যদিও হয়ত কেবল ভয়ের খাতিরে), তারা অন্য-দের অনুভূতিহীনতা বা কৃপণতা বুঝতে পারে না। তারা কোনো বিদেশী যাত্রীকে বলবে, "সে কি! তোমার চারটি সন্তান আছে, আর তুমি তার দুটিকেও এমন শক্তিশালী দেবতাকে দিতে পারছ না!" (দেবতা কাম্বলকে)। এই অধর্ম তাদের হতভম্ব করে। তাদের মনে জেগে ওঠে ক্রোধ, ঐশ্বরিক ক্রোধ আর অনাচারের শাস্তি দিতে তারা এই সব দেবদ্রোহীদের বলি দেয় তাদের ক্ষুধিত দেবতাদের কাছে। (আমি বিশেষ ভাবে পরামর্শ দেব, এ দেশে একলা ভ্রমণ করতে, সঙ্গে যেন থাকে কেবল খুব অল্প মালপত্র যা দরকার হলে কোনো গর্তে লুকিয়ে ফেলা যায়।)···

···এই দেবতার নাম "সহজ", ইনি রক্ত, বা জীবন, বা খাদ্যবস্তুতে তৃপ্ত হন না। ইনি চান একমাত্র প্রিয়জন।

যখন ছেলেকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, এমন কোন পিতা পথের শেষে দেখা দেয়, তখনই দেবতার চোখ জলে ওঠে। হায়! বোঝা যায়, তিনি কি চান, বোঝা যায় তিনি সমঝদার।

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী-খাসনবিশ

অনন্তকাল ধরে, নোনেরা অলিয়াবেরদের দাস। অলিয়াবেররা তাদের দিয়ে সাধ্যের অতীত কাজ করায়। কারণ তারা ভয় পায়, নোনেরা একটু শক্তি ফিরে পেলে সুযোগ বুঝে নিজেদের দেশে ফিরে যাবে। অবশ্য সে দেশ প্রায় সম্পূর্ণ ঊষর, আর অংশত জলের নিচে।

অত্যাচারের ফলে নোনে জাতির সংখ্যা অর্ধেক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই অলিয়াবেররা বাধ্য হয়, তাদের শিকার করার জন্য তাদের দেশে আগের চেয়ে অনেক বেশি দূরে এগিয়ে যেতে। তাদের যেতে হয় জন্মভূমি পর্যন্ত, যেখানে হয়ত নোনেরা পালাতে পারত, যদি না শিক্ষিত কুকুর নিয়ে তাদের তাড়া করা হত।

চিরকাল এই অভিযানগুলি ছিল এক জাতীয় উৎসব। সমস্ত বড় অলিয়াবের কবি এ নিয়ে গান বেঁধেছেন। কিন্তু হায়! ধরে আনা নোনেদের সংখ্যা ক্রমে কমে আসছে। যে পরিমাণ সামরিক প্রস্তুতি করা হয়, তার তুলনায় এইটুকু লাভ অকিঞ্চিৎকর। আর এর জন্য সেনাপতিরা দায়ী নন।

তাই আজকাল সরকারের তত্ত্বাবধানে, পুরুষ ও মেয়ে নোনেদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা করা হয়েছে। সেখানে তারা ধ্বংস হতে অনিচ্ছুক, স্বাভাবিক জাতির মত প্রচুর বংশবৃদ্ধি করার সুবিধা ভোগ করে।

নোনে বালক-বালিকাদের শক্ত-সমর্থ হয়ে ওঠার বয়স হলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় আভিদ্‌র্ প্রদেশে। সেখানে অলিয়াবেররা তাদের শিকার করতে আসতে পারে।...

কিন্তু নোনেরা ধৈর্য ধরে থাকে। তারা বলে, ভগবান এ জিনিস চিরকাল সহ্য করবেন না, তিনি তাঁর ঠিক সময়ের অপেক্ষা করছেন।

বলাবাহুল্য, তিনি অপেক্ষা করছেন।

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী-খাসনবিশ

মন্থরতা, বস্তুর নাড়ীর গতি পরখ করা হয়; সেখানেই নাক ডাকা; হাতে আছে সবটা সময়; ধীরেসুস্থে, সারাটা জীবন। ধ্বনিগুলোকে গিলে ফেলা হয়, ওদের গেলা হয় ধীরেসুস্থে; সারাটা জীবন। নিজের জুতোর ভেতর জীবন কাটানো। সেখানেই গৃহস্থালি। জড়োসড়ো হয়ে থাকার আর দরকার নেই। হাতে আছে সবটা সময়। চেখে দেখা। নিজের মুঠোর মধ্যে হাসা। যা জানা তা আর বিশ্বাস করা যায় না। শোনার আর দরকার থাকে না। মদ খেতে খেতে সুখী; মদ না খেতে খেতে সুখী; মুক্তো তৈরি করা। অস্তিত্ব আছে, হাতে আছে সময়। এই হোল মন্থরতা। দমকা হাওয়া থেকে নির্গত। কাঠের জুতোর স্মিতহাসি। আর ক্লান্ত নয়। খাব অভিভূত নয়। পায়ের ডগায় হাঁটু। ঢাকনার নিচে আর লজ্জা নেই। উন্নতির শিখরগুলো বেচে দেওয়া হয়েছে। নিজের সম্ভাবনাটাকে রেখে দেওয়া হয়েছে, স্নায়ুগুলোকে স্বস্তি দেওয়া হয়েছে।

কেউ একজন বলে। কেউ একজন আর ক্লান্ত নয়। কেউ একজন আর শোনে না। কেউ একজনের সাহায্যের আর দরকার নেই। কেউ একজন উত্তেজনায় আর টান টান হয়ে নেই। কেউ একজন আর অপেক্ষা করে না। একজন চেঁচায়। আরেক বাধা। কেউ একজন গড়ায়, ঘুমোয়, সেলাই করে, সে কি তুমি নরেন্দ্র?

আর পারে না, আর কিছুতেই নেই, কেউ একজন।

কিছু একটা কেউ একজনকে জোর করে।

সূর্য, কিংবা চাঁদ, কিংবা অরণ্য, কিংবা পশুর পাল, লোকজনের ভীড় কিংবা শহর, কেউ একজন তার সহযাত্রীদের ভালবাসে না। বেছে নেয়নি, চিনতে পারে না, পরখ করে না।

ভাঁটার রাণী তার থাবা আলগা করে দিয়েছে; বোঝার আর সাহস নেই; যথার্থ হওয়ার আর অভিলাষ নেই।

…আর প্রতিরোধ করে না। কড়িকাঠগুলো কাঁপে আর সে তোমরা। আকাশ কালো আর সে তোমরা। কাচ ভেঙে যায় আর সে তোমরা।

মানুষের গোপনীয় ব্যাপারটা হারিয়ে গেছে।

তারা "উদ্ভট" নাটক করে। ছোকরা এক চাকর বলে "ভ্যা" আর একটা ভেড়া তার সামনে একটা রেকাবি উপস্থিত করে। অবসাদ! অবসাদ! চারদিকে ঠাণ্ডা!

হায়! আমার বারো বছরের গোছা গোছা ডালপালা, এখন তোমরা কোথায় মড মড করছ?

নিজের কোটর রয়েছে অন্য কোথাও।

ছায়াকে নিজের জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, অবসাদে, আবর্তনের ঝোঁকে। দূরে বিশালাকৃতি ফুল আসলেপিয়াদ-এর গুঞ্জরণ শোনা যায়।

…অথবা সহসা একটি কণ্ঠস্বর তোমার হৃদয়ে আর্তনাদ করে উঠতে উপস্থিত হয়।

নিজের হারিয়ে যাওযাদের জড়ো করা হয়, এসো, এসো।

দিগন্তে নিজের চাবি খোঁজার সময় দম-আটকানো জলে যে মারা গেছে সেই জলে ডোবানো নারী গলা জড়িয়ে থাকে।

সে গড়িমসি করে। এমন সে গড়িমসি করে! সে আমাদের দুর্ভাবনার তোযাক্কা করে না। তার বড় বেশি হতাশা। সে শুধু তার যন্ত্রণার কাছেই আত্মসমর্পণ করে। হায়, দুর্ভোগ, হায়, শহীদ হওয়ার যন্ত্রণা, নিমজ্জিতা নারীর বিরামহীন আলিঙ্গনে আবদ্ধ কণ্ঠ।

পৃথিবীর বক্রতা অনুভব করা যায়। এখন থেকে এমন চুল থাকবে যাতে স্বভাবতই ঢেউ খেলে যাবে। মাটির সঙ্গে আর বেইমানি করা হয় না,

আবৃলেত মাছের সঙ্গে আর বেইমানি করা হয় না, জল আর পাতার সম্পর্কে যোন। নিজের চোখের আর দৃষ্টি নেই, নিজের বাহুর আর করতল নেই। আর ব্যর্থ নয়। আর কোন ঈর্ষা নেই। কেউ আর ঈর্ষা করে না।

আর কাজ করা হয় না। ঐ যে বোনা জামা, তৈরি, সব জায়গায়।

নিজের শেষ পাতায় সই হয়ে গেছে, এবার প্রজাপতিদের বিদায়।

আর স্বপ্ন দেখা হয় না। স্বপ্নে দেখা হয়। স্তব্ধতা।

জানবার আর কোনো তাডা নেই।

বিস্তারের কণ্ঠ নখ আর হাডের সঙ্গে কথা বলে।

অবশেষে স্বস্থানে, শুদ্ধতায়, মাধুর্যেব বর্শায় বিদ্ধ।

চোখের ভেতর ঢেউগুলোর দিকে তাকানো হয়। তারা আর ভোলাতে পারে না। হতাশ হয়ে, তারা সরে যায়, জাহাজের গা থেকে। জানা আছে, জানা আছে, কিভাবে তাদেব আদর করতে হয়। জানা আছে তাদের লজ্জা আছে, তাদেবও।

কি পরিশ্রান্ত দেখায় তাদের, তাদের দেখায কি অসহায়!

মেঘ থেকে নেমে আসে একটা গোলাপ আর নিজেকে নিবেদন করে তীর্থযাত্রীর কাছে; মাঝে মাঝে, কদাচিৎ, এমন কদাচিৎ। ঝাড়-লণ্ঠনের শ্যাওলা নেই, নেই সাংগীতিক ললাট।

আতঙ্ক! উদ্দেশ্যহীন আতঙ্ক!

নিয়ত বেড়ে ওঠা খাদ আর গুহা।

স্বর্গ ও মর্তের টুকরো, অনিচ্ছায়, অকারণে গিলে ফেলা সংসার, আর শুধু গেলার জন্যেই।

রাস্তের জলে থাকা দীপ আমার কথা শোনে। সে বলে, "তুমি বলেছ, তুমি সত্যি কথাটাই বলেছ, তোমার এটাই আমি ভালোবাসি।" এগুলোই হল দীপের যথাযথ কথা।

আমাকে ফাঁপা ছুড়িব ভেতবে সেঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পৃথিবী শোধ নিল। আমাকে ফাঁপা ছুড়ির ভেতরে সেঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ইনজেকশনের ছুঁচের ভেতরে। যেখানে দেখা করাব কথা সেই সূর্যালোকে আমি পৌছাই এটা ছিল অবাঞ্ছিত।

আর আমি ভেবেছিলাম, "বেবিযে পডব? বেরিযে পডব? নাকি কখনোই বেবোব না? কখনোই না?" সমুদ্র থেকে দূরে আর্তনাদ আবো প্রবল যেমন প্রেমাস্পদ যুবক যখন নাক উঁচিয়ে দূবে সবে যায়।

এটা খুবই জরুরী যে একটি নাবী কান্নাকাটি করার জন্য সাত সকালে শুযে পড়বে, তা নইলে সে দারুণ মুষড়ে পডবে।

লবিব ছাযায নিশ্চিন্তে যেতে পাবা। আমি আমাব কর্তব্য কবি, তুমি তোমার, কোথাও ভীড নেই।

নৈঃশব্দ্য! নৈঃশব্দ্য! এমন কি পীচ কলের শাঁস বের কবাও নয়: বিচক্ষণতা, বিচক্ষণতা।

ধনীব কাছে যাওযা হয় না। জ্ঞানীর কাছে যাওয়া হয না। বিচক্ষণ হযে, নিজের আংটায় পাকে পাকে জড়িযে থাকা।

ঘরবাড়িগুলো বাধা। বাড়ির আসবাবপত্র-বওয়া মুটেরা বাধা। সটকে পড়া এক বাধা।

ফেলে দেওয়া, ধাক্কা দেওয়া, বক্ত দিয়ে নিজের মধু সামলানো, উচ্ছেদ করা, উৎসর্গ করা, শেষ করে দেওয়া··সুগন্ধির মধ্যে বাতকর্ম স্কিটলের বেশ কিছু পিন ফেলে দেয়।

হায়! অবসাদ, এই সংসারের প্রযাস, জগৎজোড়া অবসাদ, বিতৃষ্ণা!

নরেন্দু, নরেন্দু, আমার ভয় করে···থেকে থেকে অন্ধকার, থেকে থেকে পাতার শিরশির শব্দ।

শোন। আমি মৃত্যুর গুঞ্জবণের দিকে এগিয়ে চলেছি।

তুমি আমার দীপগুলো সব নিভিয়ে দিয়েছ।

বায়ুমণ্ডল একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছিল, নরেন্দু।

আমার হাতগুলো, কী ধোঁয়া! তুমি যদি জানতে···আর মোড়ক নয়, আর বওয়া নয়, আর পারা নয়। আর কিছুই নয়, সোনা।

অভিজ্ঞতা : দুর্ভোগ ; পতাকাধারী কী যে উন্মাদ।

···আব বরাবব প্রণালী পার হতে হয়।

আমাব পাগুলো, তুমি যদি জানতে, কি ধোঁযা!

অথচ টানা গাড়িতে সারাক্ষণ আমার কাছে রযেছে তোমাব মুখ···

ক্যানারি পাখিব বদল দিয়ে তাবা আমায ঠকানোর চেষ্টা করেছিল। অথচ আমি অবিরত বলে যাচ্ছিলাম: "কাক! কাক!" তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

শোন, আমাকে অর্ধেকেবও বেশি গিলে ফেলা হয়েছে। আমি নর্দমার মত ভিজে সপসপে।

ঠাকুরদা বলে, "কোনো বছর, কোনো বছর আমি এত মাছি দেখিনি।" আর সত্যি কথাটিই সে বলে। সে অবশ্যই তা বলে···হাসো, হাসো, ছোঁড়ারা, বুঝবে না কখনোই প্রতিটি শব্দের জন্য আমাকে কতটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে হয়।

বুড়ো রাজহাঁস জলের বুকে তার পদমর্যাদা আর রাখতে পারে না।

সে আর সংগ্রাম করে না। শুধু সংগ্রামের ভাবভঙ্গী।

না, হ্যাঁ, না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি পরিতাপ করছি। এমনকি পড়ার সময় জলও দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

আমি বিড়বিড় করি। এখন আমি চেটে চেটে পাঁক খাচ্ছি। কখনো কখনো অন্তর্ভশক্তি, কখনো কখনো ঘটনা…আমি লিফটের শব্দ শুনছিলাম। তোমার মনে পড়ে, নরেন্দু, তুমি সময়মত কখনো এসে পৌঁছতে না।

খনন করা, খনন করা, শ্বাসরোধ করা, নিরন্তর যন্ত্রণার হিমায়ন। ছাই-ভস্মের ভেতরে ফুরসৎ, ক্বচিৎ, ক্বচিৎ; ক্বচিৎ মনে পড়ে।

তোমার সঙ্গে আঁধারে ঢুকে পড়া, কত মিষ্টিই না ছিল, নরেন্দু…

ঐ লোকগুলো হাসে। তারা হাসে।

তারা নড়ে চড়ে। প্রকৃতপক্ষে তারা এক বিপুল নিস্তব্ধতাকে পেরিয়ে যায় না।

তারা বলে "ঐ ওখানে"। তারা সবসময় "এখানে"।

এসে পৌঁছনোর মত সাজগোজ নেই।

তারা ভগবানের কথা বলে, কিন্তু তা তাদের পাতা দিয়ে।

তাদের নালিশ আছে, কিন্তু তা হাওয়া।

তাদের রয়েছে মরুভূমির ভয়।

…হিমের খাদে আর বরাবর পায়ে-হাঁটা রাস্তা।

আরাগাল-এর সুখ, এখানেই তোমাদের পতন ঘটে। বৃথাই তুমি নিজেকে নত কর, তুমি নিজেকে নত কর, শিঙার শব্দ, আরো নিচে, আরো নিচে থাকা…

পাতালে পাখিগুলো আমার পেছনে পেছনে উড়ছিল, কিন্তু আমি পেছনে ফিরলাম আর বললাম, "না। এখানে, পাতাল। আর নিশ্চেতনা তার বিশেষ অধিকার।"

এভাবে রাজকীয় পদক্ষেপে, আমি একা এগিয়ে গেলাম।

একসময়, যখন পৃথিবী ছিল কঠিন, আমি নাচতাম, আমার বিশ্বাস ছিল। এখন, কি করে তা সম্ভব হতে পারে ? একটি বালুকণাকে সরিয়ে নেওয়া হয়। আর সমগ্র বেলাভূমি ধ্বসে পড়ে, তুমি তো জানই।

অবসাদে, মগজের ছাল ছাড়ানো হয় আব তা জেনেশুনেই ছাড়ানো হয়, এটাই সবচেয়ে দুঃখজনক।

দুর্ভাগ্য যখন তার সুতোর টান দেয়, কেমন সে ফাঁসিয়ে দেয়, কেমনই সে ফাঁসিয়ে দেয় !

"মেঘের পেছনে ধাওয়া কব, ধব ওটাকে, আরে ওটাকে ধর" সারা সহর বাজি ধরল। কিন্তু আমি ওটা ধরতে পাবলাম না। আমি জানি, আমি পারতাম…শেষবারের মত একটা লাফ·· তবু আমাব আব ইচ্ছে ছিল না। দিশেহারা, আর সহায়-সম্বল নেই, লাফ দেওয়ার আর ইচ্ছে নেই। লোকজন কোথায় থাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বলা হয় : "হয়তো, হয়তো বা ভালো," কেবল চেষ্টা টিপে যেন মারা না হয়।

শোন, আমি চোরাবালিতে নিমজ্জিত ছায়ারও ছায়া।

তোমার আঙুলগুলোতে এমন চপল, এমন ত্বরিতগতি, একটি স্রোত, সে এখন কোথায়…যেখানে আগুনের ফুলকি বয়ে যেত। আব সবার হাত মাটির মত, একটা কবরের মত।

জুআনা, আমি থাকতে পারছি না, সত্যি বলছি তোমায়। তোমার জন্য আমার কাঠের একটা পা রয়েছে লক্ষ্মীর ভাঁড়ে। আমার খড়ি-ওঠা হৃদয়, আঙুলগুলো মৃত তোমার জন্য।

ছোট ছোট শুম্ভের ক্ষুদ্র হৃদয়, আমাকে আরো আগে আটকানো উচিত ছিল। তুমি আমার নিঃসঙ্গতা নষ্ট করেছ। তুমি আমার চাদর কেড়ে নিয়েছ। তুমি আমার ক্ষতচিহ্নগুলোকে ফুটিয়ে তুলেছ।

সে আমার হাঁটুর ওপরে রাখা ভাত নিয়ে নিয়েছে। সে আমার হাতে থুথু দিয়েছে।

আমার ডালকুত্তাকে একটা থলেতে পুরে রাখা হয়েছিল। বাড়িটা নিয়ে নেওয়া হয়েছে, শুনতে পাচ্ছ, যে চেঁচামেচিটা সে করল শুনতে পাচ্ছ, যখন, অন্ধকারের সুযোগে, ওরা তাকে নিয়ে গেল, মাঠের মাঝখানে সীমানার খুঁটির মত আমাকে ফেলে গিয়ে। আর আমি ভয়ানক ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছিলাম।

দিগন্তে ওরা আমায় শুইয়ে দিয়ে গেল। ওরা আমায় আর উঠতে দিল না। হায়! যখন লোকে বাঘের কবলে পড়ে···

মহাসমুদ্রের নিচে রেলগাড়ি, কি যন্ত্রণা! বুঝলে. সেটা মোটেই আর বিছানায় পড়ে থাকা নয়। তারপর রাণী হওয়া, যোগ্যতাও রয়েছে তা হওয়ার।

কথাটা তোমাকে বলছি, কথাটা তোমাকে বলছি, সত্যিই যেখানে আমি রয়েছি, আমি জীবনকেও জানি। আমি তাকে জানি। ক্ষতস্থানের চেতনা তার সম্পর্কে অনেক কথা জানে। সে তোমাদেরও দেখে, বুঝলে, আর তোমরা যে যেমন, তোমাদের সবাইকে বিচার করবে।

হ্যা, আঁধার, আঁধার, হ্যা উদ্বেগ। বিষাদক্লিষ্ট বীজবপনকারী। কী যে নৈবেদ্য! সীমানাচিহ্নগুলো ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পালিয়ে গেল। উন্মত্ততার উদ্দেশে, জলোচ্ছ্বাসের উদ্দেশে, সীমানাচিহ্নগুলো দৃষ্টিপথ পেরিয়ে পালিয়ে যায়।

মহাদেশগুলি, কেমন দূরে সরে যায়, আমাদের মরতে দেওয়ার জন্য কেমন তারা দূরে সরে যায়! বেদনা'র গান গাওয়া আমাদের হাতগুলি শিথিল হয়ে গেল, বিশাল পাল তুলে পরাজয় চলে গেল মন্থর গতিতে।

জুআনা! জুআনা! যদি আমার মনে থাকে···তুমি জান যখন তুমি বলেছিলে, তুমি জান, তুমি আমাদের দুজনের হয়ে তা জান, জুআনা!

হায়! সেই বিদায়! কিন্তু কেন? কেন? শূন্যতা? শূন্যতা, শূন্যতা, যন্ত্রণা; যন্ত্রণা, সমুদ্রের বুকে যেনবা একটিমাত্র বিশাল মাস্তুল।

গতকাল, এই গতকালই, গতকাল, তিন শতাব্দী আগে; গতকাল, আমার সাদাসিধে আশাকে মচমচ করে চিবিয়ে, গতকাল, তার দরদী গলা হতাশাকে ধুলোয় মিশিয়ে, সন্ধ্যার বাতাসে সহসা আন্দোলিত গাছে, ডানার ওপরে উল্টে পড়া এক গুবরে পোকার মত, হঠাৎ পেছনে হেলানো তার মাথা, তার আনেমোন ফুলের ছোট্ট হাতগুলো জড়িয়ে না ধরে ভালবেসে, আকাঙ্ক্ষা যেমন জল গড়িয়ে পড়ে…

গতকাল, তোমার শুধু একটা আঙুল বাড়িয়ে দিলেই হত, জুআনা; আমাদের দুজনের জন্য, দুজনেরই জন্য, তোমার শুধু একটা আঙুল বাড়িয়ে দিলেই হত।

স্বপন দাসমহাপাত্র

সমুদ্র

যা আমি জানি, যা আমার, তা হল অনির্দিষ্ট সমুদ্র।

একুশ বছর বয়সে আমি পালিয়ে এসেছিলাম সহরের জীবন থেকে। হয়েছিলাম নাবিক। জাহাজে কাজ থাকত। আমি অবাক হতাম। আমি ভেবেছিলাম, জাহাজে লোকে কেবল সমুদ্র দেখে। অনন্তকাল সমুদ্র দেখে।

জাহাজগুলোকে নিরস্ত্র করা হল। সুরু হল সমুদ্রের মানুষদের বেকার দশা।

আমি পেছন ফিরে চলে গেলাম, কিছু বললাম না, আমার ভেতরে সমুদ্র, আমার চারদিকে চিরন্তন সমুদ্র।

কোন সমুদ্র? সে কথা আমি স্পষ্ট করে বলতে পারব না।

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী-খাসনবিশ

লাজারাস, তুমি ঘুমিয়ে আছো ?

যুদ্ধ স্নায়ুর যুদ্ধ
মাটির
কর্তৃত্বের
জাতির
ধ্বংসের
লোহার
চাকরদের
টুপির
বাতাসের
বাতাসের
বাতাসের
বাতাসের চিহ্নের, সমুদ্রের, মিথ্যার,
সীমান্তের, জট পাকানো—আমাদের জটে জড়ানো দুঃখের
অস্ত্রের তলায়, ঘৃণার তলায়
গতকালের তলায় পড়ে যাওয়া মূর্তির ধ্বংসের তলায়
"ভেটো"র বিরাট ফাঁদের তলায়
জঞ্জালের মধ্যে বন্দী
আগামীকালের তলায় মাজা ভাঙা, আগামীকালের তলায়
আগামীকালের তলায়
ইতিমধ্যে কোটি কোটি মানুষ
বিদায় নিচ্ছে মৃত্যুর পথে
একটা আর্তনাদ অব্দি না করে
কোটি কোটি মানুষ
থার্মোমিটার জমে যাচ্ছে একটা পায়ের মত
কিন্তু এক প্রচণ্ড জোরালো কণ্ঠস্বর…
আর কোটি কোটি মানুষ আদেশ মেনে উত্তরে বা দক্ষিণে
বিদায় নিচ্ছে মৃত্যুর পথে

লাজারাস, বল, তুমি কি ঘুমিয়ে আছো ?

ওরা মরছে, লাজারাস
ওরা মরছে
শবের আচ্ছাদন ছাড়া
মার্থা বা মেরিকে ছাড়া
এমনকি অনেক সময় মৃতদেহ ছাড়া
পাগল যেমন শামুকের খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে হাসে
আমি চিৎকার করছি
আমি চিৎকার করছি
আমি চিৎকার করছি বুদ্ধিভ্রংশের মত তোমার উদ্দেশে
তুমি কিছু শিখে থাকলে
এবার তোমার পালা
তোমার পালা, লাজারাস !

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী-খাসনবিশ

স্থান, মুহূর্ত, কালের উত্তরণ

বিস্তার যা বিস্তৃত করে, বেড়ে ওঠে, প্রসারিত হয়, আমায় প্রসারিত করে। কী যে ঘটে, যা হাল ছেড়ে দেয়, সংগীত যা আমায় অন্তর্বাস পরিয়ে দেয়, আমায় অবগাহন করায়। উষার আলোয় ভরপুর মাথা, অর্গলহীন দরজাগুলো ঠেলে ঠেলে আমি এগিয়ে যাই।

আরো অবসাদ। আশ্চর্যের ইন্দ্রধনু। এমন সুন্দর এই পুনর্জীবন : চার-দিকে চেতনাময় প্রভাত। একি সম্ভব? একি সত্য? অমঙ্গল, উদ্বেগজনক অন্তহীন অমঙ্গল, আচ্ছাদন, অদৃশ্য এক আচ্ছাদন তাকে অন্তর্হিত করে দিয়েছে।

আনন্দ! আমায় আর নিচে নেমে যেতে হবে না।

আবির্ভাব, নতুন এক আবির্ভাব। আবির্ভাবের নদী বয়ে চলে যায়। আবির্ভাব ছাড়া আর কিছুই নেই।

উচ্ছ্বাস, অন্তহীন উচ্ছ্বাস, যত নিষেধকে পরিমিতিকে দূরে সরিয়ে দেয়, ভরিয়ে দেয়, ভরিয়ে দেয়, সমাধি-সৌধ যা আবার বয়ে যাবে। প্রস্তাবিত ঢেউয়ের ওপর আমার ঢেউগুলি, নিজস্ব ঢেউগুলি, ঢেউয়ের ওপর ভ্রাম্যমাণ ঢেউগুলি।

মুহূর্তগুলি, গতিপথহীন, সম্বলহীন, প্রত্যাবর্তনহীন, মিলনহীন, প্রবহমান, স্বাধীন মুহূর্তগুলি।

একটি বৃন্ত মুহূর্ত, একটি নিরস্ত্র মুহূর্ত, একেবারে ধরা পড়া একটি মুহূর্ত চলে যায়। একটি মুহূর্ত আগে আগে চলে, একটি মুহূর্ত তাড়াহুড়ো করে, একটি মুহূর্ত ডাক দেয়, প্রতিধ্বনি একটি মুহূর্ত।

একটি মুহূর্ত আবার চলে যায়, ছেড়ে যায়, সাবিতে দাঁড়ায়, তারপর একটি মুহূর্ত, একটি মুহূর্ত ডুবে যায়, একটি আত্মীয় মুহূর্ত, আবার দেখাব একটি মুহূর্ত।
আবার একটি মুহূর্ত।

স্থির একটি মুহূর্ত, নিজের জায়গা পাল্টানোর সুরুর একটি মুহূর্ত, অন্ধকার একটি মুহূর্তের আবিষ্কার কোরে, একটি মুহূর্ত আগাগোড়া আন্দোলিত করে।

চূড়ান্ত 'না'-র একটি মুহূর্ত; আরো দ্বিধান্বিত একটি মুহূর্ত, অনুকূল, আনুকূল্য দেখানো, অমায়িক একটি মুহূর্ত, আমার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সঙ্গত একটি মুহূর্ত, স্বর্ণশাখার চাহিদার একটি মুহূর্ত।

গলুইয়ের ফিরে আসা একটি মুহূর্ত, শিক্ষার্থী একটি মুহূর্ত, এখনো অকপট একটি মুহূর্ত, একটি মুহূর্ত যে কেবল প্রশস্তি করে, একটি মুহূর্ত যে পেছনে ফিরিয়ে আনে, একটি মুহূর্ত যে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য রেখেছিল।

একটি মুহূর্ত যে সবকিছু পাল্টে দিতে চলেছে।
অতুলনীয় একটি মুহূর্ত।

ভ্রমণরত একটি মুহূর্ত, ভ্রমণ থেকে ফিরে আসা একটি মুহূর্ত।
আরো যত মুহূর্তকে ডাক দেওয়া একটি মুহূর্ত।

জলধারার বুকে একটি মুহূর্ত, বাতাসের ডানায় একটি মুহূর্ত, একঝাঁক মুহূর্তের ওপর ফের পড়ে যাওয়া একটি মুহূর্ত।

পিছলে পড়া একটি মুহূর্ত। চোখের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া একটি মুহূর্ত। ফিরে আসে একটি মুহূর্ত।

ইতিমধ্যে ফিরে যাওয়া একটি মুহূর্ত।

একটি মুহূর্ত যে আর এগিয়ে যায় না। আশঙ্কায় ভারী একটি মুহূর্ত।

একটি মুহূর্ত ইতিমধ্যেই যে কালের পদধ্বনি শুনিয়ে দেয়।

একটি মুহূর্ত যা ছিল নিতান্তই একটা ফাঁক। বিধ্বস্ত একটি মুহূর্ত।
কোন কিছুরই সঙ্গে জড়িয়ে নেই এমন একটি মুহূর্ত এখন দীপ্তিময়।

এখনো অনাগত একটি মুহূর্ত।
অন্য এক জীবনের একটি মুহূর্ত।

শিহরিত একটি মুহূর্ত। একটি মুহূর্ত যে বরং হৃদয়কে শান্ত করে।

কাটাকুটিহীন একটি মুহূর্ত। যথার্থই শালুক একটি মুহূর্ত।

একটি মুহূর্ত যে রাস্তা পার হয়ে যায়। একটি মুহূর্ত যে জোর করে না।
বরং ভবঘুরে একটি মুহূর্ত।

মহান মুহূর্তগুলির পরবর্তী একটি মুহূর্ত।

উত্তেজক একটি মুহূর্ত, একটি মুহূর্ত যে আমার ওপর আস্থা রাখতে চায় না, গোলাপের পাপড়ির ওজন একটি মুহূর্ত পরে যে সীসার মতো ভারী হয়ে উঠবে।
একটি মুহূর্ত অবশ্যই যেন ও আর আসবে না।

আমাকে ছাড়া যাযাবরেরা। মুহূর্তেরা, লঘু মুহূর্তেরা, উজ্জ্বল পাঁকের ভেতর, প্রাণচঞ্চল, খুদে উপনদীগুলি।

কারো জন্য নয় এমন অর্ঘ্য, অক্ষরহীন কণ্ঠ, যন্ত্রহীন ধ্বনি, অবিরত পাল্টে যায় যে সঙ্গীরা, মুকুলিত সঙ্গীত।

আগত, বিগত, সীমানাহীন, সমস্ত পরিপূর্ণতার প্রবাহিত প্রতিবন্ধক, বিচ্ছেদের শিক্ষা না দিয়েই বিচ্ছিন্ন করা এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া,

মুহূর্তেরা, মর্মর-ধ্বনি, কালের উত্তরণ।

পুষ্কর দাশগুপ্ত



ফ্রঁসিস পোঁজের কবিতা

ফ্রঁসিস পোঁজ

সিগারেট

প্রথমেই উপস্থাপিত করি আলুথালু, একই সঙ্গে ধোঁয়াটে আর শুকনো পরিমণ্ডল যেখানে ঐ পরিবেশ সৃষ্টি করার পর থেকে সিগারেট সারাক্ষণ উল্টোভাবে বসানো রয়েছে।

এরপর তার আকৃতি: যতটা দীপ্ত তার চেয়ে অনেক বেশি গন্ধময় ছোট্ট একটা মশাল, তার থেকে পরিমাপ করা যায় এমন তালে গণনীয় সংখ্যার ছাইয়ের ছোট ছোট পুঞ্জ খসে পড়ে।

সবশেষে তার পবিত্র মৃত্যু-যন্ত্রণা: রূপালি চামড়া খসে পড়া এই জ্বলন্ত বোতাম, অতি সম্প্রতি গড়ে ওঠা একটা অব্যবহিত আংটা তাকে ঘিরে থাকে।

পুষ্কর দাশগুপ্ত

রুটি

রুটির ওপরটা দারুণ, কেননা প্রথমে তার থেকে একটা আধা প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুভব লাভ করা যায়; যেনবা হাতের কাছেই ইচ্ছেমতন রয়েছে আল্পস্, তোরাস কি এণ্ডিজ পর্বতমালা।

এভাবে উদ্গার তুলতে থাকা একটা আকারহীন তালকে আমাদের জন্য নাক্ষত্র চুল্লীর মধ্যে পুরে দেওয়া হোল, সেখানে শক্ত হয়ে উঠতে উঠতে ওটা উপত্যকা, পর্বতশিখর, তরঙ্গ, খাদের আকার নিল··· আর তখন থেকে এই ছকগুলি সব এমন একেবারে জোড়া, এই পাতলা শানের টালিগুলি যার ওপর আলোক সযত্নে তার আগুনকে শুইয়ে দেয়,—নিচের নগণ্য কোমলতার দিকে একবারও চোখ ফেলে না।

ঐ আলগা আর ঠাণ্ডা মাটির তলা যাকে বলা হয় রুটির বুক তার তন্তু

স্পঞ্জের তন্তুর মতন: পাতা বা ফুল সেখানে শ্যামদেশীয় যমজ বোনের মত কনুয়ে কনুয়ে সেঁটে রয়েছে। রুটি যখন বাসি হয়ে ওঠে তখন ঐ ফুলগুলো শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়, একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, আর তালটা ঝুরঝুরে হয়ে পড়ে…

এবার তবে ওটাকে ভাঙা যাক — কেননা সম্মানের জিনিস হওয়ার চেয়ে রুটির হওয়া উচিত আমাদের মুখের মধ্যে ভোগের জিনিস।

পুষ্কর দাশগুপ্ত

আগুন

আগুন একটা বিন্যাস করে নেয়: প্রথমে সবগুলো শিখা কোন একটা দিকে ছুটে যায়…

(আগুনের চলাকে প্রাণীদের চলার সঙ্গে তুলনা করা যায় না: একটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে তবে অন্য একটা জায়গা তাকে দখল করতে হয়, আগুন একই সঙ্গে অ্যামিবা আর জিরাফের মতন চলে, ঘাড় থেকে লাফিয়ে ওঠে, পা থেকে বুকে হেঁটে চলে)…

তারপর, যখন নির্দিষ্ট নিয়মে ঝুলকালি মাখা বস্তু-পিণ্ডগুলো ধসে পড়ে, তখন যেসব বাষ্প বেরিয়ে আসে সেগুলো ক্রমশ একসার প্রজাপতিতে পরিণত হয়ে যায়।

পুষ্কর দাশগুপ্ত

প্রজাপতি

যখন বোঁটার ভেতর ক্রমশ তৈরী হওয়া শর্করা, অযত্নে ধোয়া পেয়ালার মতন ফুলগুলির তলায় উঠে আসে, দারুণ কর্মচাঞ্চল্য জেগে ওঠে মাটির বুকে— যেখান থেকে প্রজাপতিরা হঠাৎ উড়তে সুরু করে।

তবে যেহেতু প্রতিটি শুঁয়াপোকার ছিল দৃষ্টিহীন কালো হয়ে থাকা মাথা,

আর যথার্থ বিস্ফোরণে বিশীর্ণ শরীর যায় থেকে তার সুষম ডানাগুলি জলে ওঠে।

সেই থেকে অস্থির প্রজাপতি গতিপথের এখানে ওখানে ছাড়া আর বসে না, বা ওরকমই কিছু একটা করে।

উড়ন্ত দীপশলাকা, শিখা তার সংক্রামক নয়। আর তাছাড়া খুবই বিলম্বে সে হাজির হয় আর শুধু ফোটা ফুলগুলোরই সে পরিচয় পায়। হলে কি হবে: প্রদীপ-জ্বালিয়ের মত যেতে যেতে সে প্রতিটি ফুলের তেলের সঞ্চয় কতটা দেখে নেয়। ফুলের মাথার ওপর সে সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলা নিজের অপুষ্ট শরীরটাকে রাখে আর এমনি করেই তার দীর্ঘ অবয়বহীন শুঁয়াপোকার অবমাননার শোধ নেয়।

বাড়তি পাপড়ি ভেবে বাতাস তাকে খারাপ ব্যবহার করে—বায়ুমণ্ডলের খুদে পালতোলা নৌকা, সে ঘুরে বেড়ায় বাগানে।

পুরুষ দাশগুপ্ত

তিনটি দোকান

মোবের স্কোয়ারের কাছে, যে জায়গায় প্রতিদিন ভোরবেলা আমি বাসের জন্য অপেক্ষা করি, সেখানে পাশাপাশি রয়েছে তিনটি দোকান: গয়নার দোকান, কাঠ আর কয়লার দোকান, মাংসের দোকান। একের পর এক তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে আমার চোখে পড়ে ধাতু, দামী পাথর, কয়লা, কাঠের গুঁড়ি আর মাংসের টুকরোর বিভিন্ন আচরণ।

ধাতুর কাছে বেশিক্ষণ আমাদের দাঁড়াতে হবে না। ধাতুগুলি হোল খনিজ কর্দম আর কিছু কিছু আকরিক পিণ্ডের ওপর মানুষের প্রচণ্ড এবং বিভাজন-কারী কর্মের ফল। ঐ জিনিসগুলির ওরকম কোন অভিপ্রায় কখনোই ছিল না। দামী পাথরগুলোর কাছেও দাঁড়াতে হবে না—ওদের দুষ্প্রাপ্যতা সত্যি এমনই করে তুলবে যে প্রকৃতি-বিষয়ে পক্ষপাতহীনভাবে রচিত কোন ভাষণে খুব বাছাই করা কিছু শব্দই ওদের শুধু মঞ্জুর করা যায়।

আর মাংসের ব্যাপারে বলতে গেলে, তাকে দেখলে একটা কাঁপুনি, এক

ধরনের আতঙ্ক বা সমবেদনা আমাকে একান্তভাবে সতর্ক থাকতে বাধ্য করে। আবার সবেমাত্র কাটা হলে একটা স্বয়ম্ভূ জলীয় বাষ্প বা ধোঁয়ার আবরণ তাকে যথার্থ বিতৃষ্ণার পরিচয় দিতে উৎসুক দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখে : যখন আমি এক মিনিট তার স্পন্দিত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেলব তখন আমি যা পারি বলে দেব।

তবে কাঠ আর কয়লার দিকে মনোযোগ দেওয়াটা আনন্দের একটা উৎস। ঐ আনন্দ যতটা সংযত এবং নিশ্চিত ততটাই সহজ, যা আমি ভাগ করে দিতে খুশি হবো। নিঃসন্দেহে ওতে কয়েক পাতা লেগে যাবে, সে জায়গায় এখানে আমি খরচ করছি শুধু এক পাতার অর্ধেকটা। এ কারণে আমি আপনাদের কাছে গভীর চিন্তার জন্য এই বিষয়টা উত্থাপিত করেই সন্তুষ্ট থাকছি : "১) খণ্ড খণ্ড কাজের সময় মৃত্যুর দ্বারা শোধ নেয়। ২) বাদামী, কেননা বাদামী হোল অঙ্গারীভবনের পথে সবুজ এবং কালোর মাঝামাঝি, কাঠের ভাগ্যের মধ্যে—সামান্যতম হলেও একটা ভঙ্গি রয়েছে, অর্থাৎ কিনা ভ্রম, ভুল পা ফেলা, আর সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি।"

পুষ্কর দাশগুপ্ত

বাক্‌পটুত্ব

আমার মনে হয় প্রশ্নটা হোল কয়েকজন যুবককে আত্মহত্যা ও পুলিশ কিংবা দমকল বাহিনীতে নাম লেখানো থেকে বাঁচানোর। আমি তাদের কথা ভাবছি যারা আত্মহত্যা করে বিতৃষ্ণায় কেননা তারা বুঝে ফেলে যে "অন্যেরা" তাদের মধ্যে অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে।

তাদের বলা যেতে পারে : অন্ততপক্ষে তোমাদের সংকুচিত নিজস্বতাকে ভাষা দাও। কবি হও। তারা উত্তর দেবে : কিন্তু ওখানেই বিশেষ করে, ওখানেও আমি দেখি অন্যদের আমার জায়গায়, যখন আমি নিজেকে প্রকাশ করতে চাই, পারি না। সব কথাই তৈরী হয়ে আছে, আর তৈরী হয়ে

প্রকাশিত হয়। কিন্তু তারা আমার কথা মোটেই বলে না। এখানেও আমি শ্বাসরুদ্ধ।

তখন শেখানোর প্রয়োজন হয় কী করে কথার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, শুধু বলা যেটা বলতে চাই, কেমন করে শব্দগুলোকে তীক্ষ্ণ আর তীব্র করে তোলা যায়, কেমন করে তাদের বানানো যায় আমার ক্রীতদাস। সব মিলিয়ে শব্দ আর কথা সাজানো, কিংবা, বরং বলা যায়, প্রতিটি লোককে তার নিজের কথা গুছিয়ে বলতে শেখানো, সমাজের যেকোন মহৎকর্মের মতই একটি।

তা রক্ষা করে সেই নিঃসঙ্গ, অতি অল্প কয়েকজন মানুষকে—যাদের রক্ষা করা সত্যিই প্রয়োজন। যারা সচেতন, উদ্বিগ্ন, আর যাদের মধ্যে রয়েছে অন্যের সম্পর্কে কেবল বিরক্তি আর ঘৃণা।

সেই কয়েকজন যারা চেতনার বিকাশ ঘটাতে পারে, এবং, সত্যি কথা বলতে কি, যারা পারে চারপাশের এই জিনিসগুলোর আকৃতি বদলে দিতে।

কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

উপবৃত্তাকার রেজিস্টার

শহরের প্রায় জনমানবহীন পরিত্যক্ত যে এলাকার মধ্য দিয়ে আমি চলেছিলাম, সেটি আর কিছুই নয় শহরের সযত্নে নির্মিত বিশালকায় প্রাচীরগুলোর বেষ্টনী দিয়ে তৈরি অনেকগুলো প্রকাণ্ড অংশের একটি; ডুবু ডুবু সূর্যের আলোয় তখন তা লাল হয়ে আছে।

আমার বাঁদিকে চলে গিয়েছে রাস্তা, সেখানে ছোট ছোট বাড়ি। শুকনো খটখটে আর ময়লা সেই রাস্তাটি এক আধা-নিভন্ত আনন্দময় আলোয় ভেসে যাচ্ছে। কোনাকুনি দেখা যাচ্ছে একটু হেলে পড়া একটা গাছকে ঘিরে ছোট্ট একটা নাগরদোলা—ছোট একটা পেয়ারাগাছের চেয়ে খুব বেশি বড় নয়; তাতে ঘুরছে কতকগুলো বাচ্চা ছেলেমেয়ে, যাদের একজনের গায়ে হলুদ সোয়েটার।

আমি একটা বাজনা শুনতে পাচ্ছিলাম—যেন অনেকগুলো বেহালা বেজে চলেছে, তালে তালে, কিন্তু কোন সুরের বালাই নেই।

বাতাসে অনুভব করছিলাম খুব বিরাট কিছু একটার আবির্ভাব, যা কোন রাজনৈতিক কিংবা সামরিক ঘটনার চাইতে বরং বলা যেতে পারে কোনও একটা খুব বড় বুদ্ধিবৃত্তি বা যুক্তিতর্ক সমন্বিত ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

আমি সেদিন নৈশভোজে আপ্যায়িত সেই সাহিত্যিকের বাড়িতে, যিনি আমার অগ্রজ, সমকালীন সাহিত্যের রাজাদের একজন। আমি নিশ্চয় জানতাম তার মুখে শুনতে পাব যে আমাদের মানসিক নৈকট্য চিরস্থায়ী হবে।

নিজেকে আমার মনে হচ্ছিল এক বিজয়ী, এই বেহালার ঝংকারে সম্মানিত।

একই সঙ্গে আমি অনুভব করছিলাম আমার মুখে হাতের চেটোয় এক পড়ন্ত, অথচ খুব কাছাকাছি গনগনে সূর্যের তাপ; এবং তখনই সহসা বুঝতে পারলাম যে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, যখন, জেগে উঠতে গিয়ে দেখি, আর চোখ খুলতে পারছি না।

চোখের পাতার অনেকরকম কসরতের পরেও আমি তা খুলতে পারলাম না। আসলে হয়েছিল কি, পরে আমি যা বুঝেছিলাম, ওই চোখের পাতার ব্যাপারটাতে আমি গোলমাল করেছিলাম। আমি চাপ দিচ্ছিলাম ক্রমাগত অক্ষিগোলকের ওপর—ফলে চোখ গিয়েছিল উলটে।

ব্যাপারটা প্রায় করুণ হয়ে উঠেছিল, এমন সময় একটুক্ষণের জন্যে আমি আমার সবরকম চেষ্টা ছেড়ে দিলাম, আমার চোখের পাতা আপনা আপনিই খুলে এল, আর আমি দেখতে পেলাম উপবৃত্তাকার রেডিয়েটারের গনগনে কুণ্ডলীটা, আমার চেয়ারেই একটা বইয়ের স্তূপের ওপর বসানো, যা আমাকে আঁচ দিচ্ছে।

আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কলমের খাপটা আঙুলের ফাঁকে, অন্য হাতে আমার লেখার সরঞ্জাম, নিচে আঁচড়হীন শাদা পাতাটা যাতে শুধু আমি লিপিবদ্ধ করতে পারি যা ঘটে গেল আগে, সমাপ্তির জন্যে বহুযত্নে রাখা এই শিরোনামটির তলায়—"দিনশেষের আলোয় বিজয়ের অনুভূতি, আর তার ভয়াবহ পরিণতি।"

কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

রেডিও

বাইরে থেকে এই পালিশ করা বাক্সটার কিছুই দেখা যায় না। শুধু একটা বোতাম একটু পরে টিক্ করে ওঠা পর্যন্ত ঘুরিয়ে দেওয়া, যাতে ভেতরে অ্যালুমিনিয়মের কয়েকটা ছোট ছোট আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি অবিলম্বে মৃদু জ্বলে ওঠে, যখন হিংস্র যত চিৎকার বেরিয়ে এসে আমাদের মনোযোগ নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিতণ্ডা বাধায়।

আশ্চর্য নির্বাচন ক্ষমতাওয়ালা ছোট্ট একটা যন্ত্র, আহা, নিজের কানকে এমন উন্নত করতে যন্ত্রটা কী যে দক্ষ! কি জন্য? তাতে জঘন্যতম অসভ্যতার অত্যাচারকে অবিরাম ঢেলে দেওয়ার জন্য।

বিশ্ব স্বরের গোময়-গোমূত্রের সবটা প্রবাহ।

তা বেশ, যাই হোক এটাই ঠিক! গোবরটাকে বাইরে বের করে রোদে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত: এমন একটা প্লাবন প্রায়শ উর্বর করে তোলে··· তবু, ব্যাপারটা সাঙ্গ করার জন্য দ্রুত পায়ে বাক্সটার কাছে ফিরে আসা যাক।

কয়েক বছর ধরে ঘরে ঘরে সমাদৃত—সবগুলি জানলা হাট করা বৈঠকখানার মাঝখানে গুঞ্জনময়, উজ্জ্বল, ক্ষুদ্রাকার দ্বিতীয় ডাস্টবিন।

পুষ্কর দাশগুপ্ত

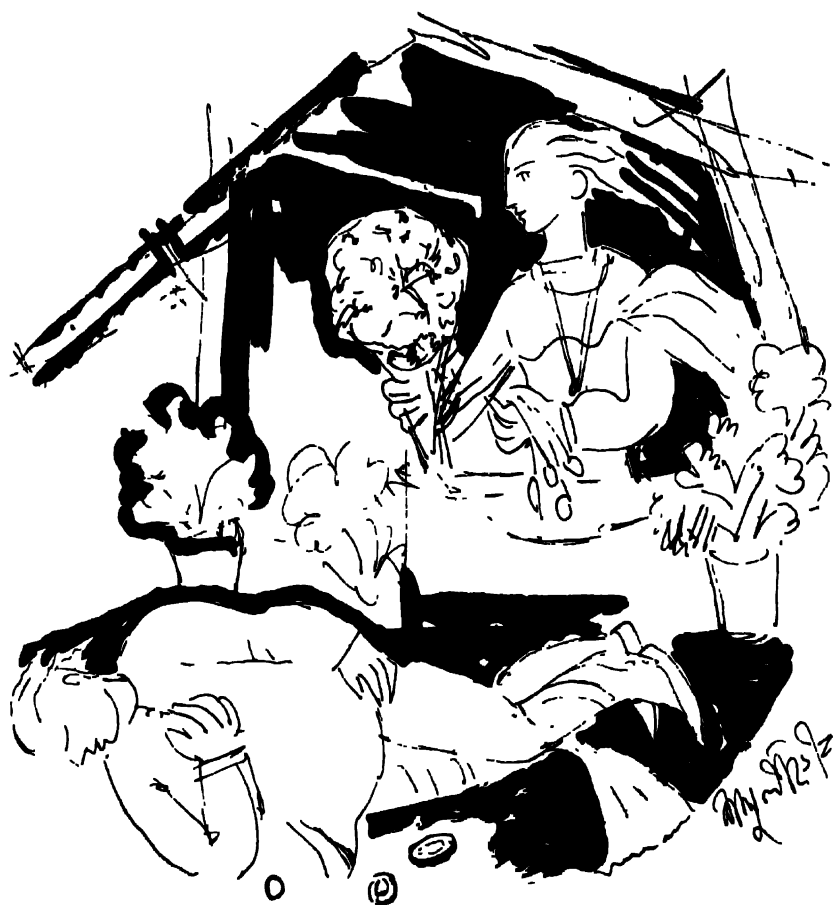
স্যুটকেস

আমার স্যুটকেস ভানোয়াজ পাহাড় অবধি আমার সঙ্গে থাকে, আর এর মধ্যে তার নিকেল ঝকঝক করতে থাকে আর তার মোটা চামড়া গন্ধ ছড়ায়। তাকে আমি হাতের চেটোয় রাখি, তার পিঠ, ঘাড় আর গায়ে হাত বুলিয়ে দিই। কেননা ঐ বাক্সটা বইয়ের মতন সাদা ভাঁজ করা সম্পদে ভরা: আমার একমাত্র বস্ত্র, আমার প্রিয় পাঠ্যবস্তু আর সবচেয়ে সাদামাটা জিনিসপত্র,

সত্যি, বইয়ের মতন ঐ বাক্সটা আবার একটা ঘোড়ারও মত, আমার পায়ে পায়ে অবিচল লেগে থাকে, তাকে জিন পরাই, সাজসজ্জা পরাই, ছোট্ট একটা বেঞ্চির ওপর, জিন পরাই আব লাগাম লাগাই, বহুক্রান্ত হোটেলের ঘরের ভেতর জিন লাগাই আব ফিতে বাঁধি।

সত্যি, একালের একজন ভ্রমণকারীব কাছে স্যুটকেসটা ঘোড়ার অবশেষ হয়ে রয়েছে।

পুষ্কর দাশগুপ্ত



জাক প্রেভেরের কবিতা

জাক প্রেভের

বার্বারা

স্মরণ করো বার্বারা
সেদিন ব্রেস্ত-এর উপর অবিরাম বৃষ্টি পড়ছিল
তুমি হেঁটে চলেছিলে হাসিমুখে
ধারাস্নানে বৃষ্টির সুখে
বিকশিত হ'য়ে
স্মরণ করো বার্বাবা
অবিরাম বৃষ্টি পডছিল ব্রেস্ত-এব উপব
আমি তোমার পাশ দিয়ে চ'লে গেলাম
সিয়াম সরণিতে
তুমি হাসছিলে
আমিও তেমনি হাসছিলাম
স্মরণ করো বার্বারা
তোমাকে আমি চিনতাম না
তুমি আমাকে চিনতে না
স্মরণ করো
স্মরণ করো তবুও সেই দিনটা
ভুলো না
একটি লোক বারান্দার নিচে আশ্রয় নিয়েছিল
সে তোমার নাম ধ'রে ডাকল
বার্বারা
এবং তার দিকে তুমি ছুটে গেলে
ধাবাস্নানে বিকশিত হ'য়ে
তারপর তার বাহুবন্ধনে তুমি ধবা দিলে
স্মরণ করো সে-কথা বার্বারা
আমার উপর রাগ কোরো না যদি তোমাকে
আমি তুমি-তুমি করি

যাদের আমি ভালোবাসি তাদের সকলকে তুমি বলি
এমনকি যদি তাদের শুধু একবারই দেখে থাকি
যারা পরস্পরকে ভালোবাসে আমি তাদের তুমি বলি
এমনকি যদি তাদের আমি নাও চিনি
স্মরণ কবো বার্বারা
ভুলো না সেই নম্র আনন্দিত বৃষ্টি
তোমার আনন্দিত মুখের উপর
সেই আনন্দিত শহরের উপব
সেই বৃষ্টি সমুদ্রেব উপব
অস্ত্রশালার উপর
জাহাজের উপর
ও বার্বারা
যুদ্ধটা কী ধাষ্টামো
এই লোহা আর আগুন
আর ইস্পাত আর বক্তেব বৃষ্টিব মধ্যে
তোমার কী হল
আর সেই লোকটার যে তোমাকে বুকে চেপে ধরেছিল
ভালোবেসে
সে কি ম'রে গেল নিখোঁজ হল নাকি এখনও বেঁচে
ও বার্বারা
অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে ব্রেস্ত-এর উপর
আগে যেমন পড়ত
কিন্তু তা আব একরকম নয় সবই নষ্ট হয়েছে
এ বৃষ্টি শোকেব আশাহীন সাংঘাতিক
এমনকি লোহা ইস্পাত রক্তের
ঝড়ও এ আর নয়
এ নিছক মেঘ
যা রাস্তার কুকুরের মতো ফেটে যায়
সেই সব কুকুরের মতো যারা
ব্রেস্ত-এর জলের স্রোতে অদৃশ্য হয়

আর দূরে গিয়ে পড়ে
দূরে ব্রেন্ত থেকে অনেক দূরে
যাদের কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না।

অরুণ মিত্র

ফুলওয়ালীর দোকানে

একজন লোক ঢুকল ফুলওয়ালীর দোকানে
ফুল বাছাই করল
ফুলগুলোকে জড়িয়ে দিল ফুলওয়ালী
লোকটা পকেটে হাত দিল
টাকা বের করবার জন্যে
ফুল কেনার টাকা
কিন্তু সেই সময় সে
হঠাৎ
হাত দিল তার হৃদয়ের উপরে
এবং প'ড়ে গেল
যখন সে পড়ল সেই সময়
টাকা গড়িয়ে পড়ল
তারপর ফুলগুলো পড়ল
লোকটার সঙ্গে সঙ্গে
টাকার সঙ্গে সঙ্গে
ফুলওয়ালী দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে
আর টাকা গড়াতে লাগল
ফুলগুলো নষ্ট হ'য়ে এল
লোকটা মরতে থাকল
স্পষ্টতই ব্যাপারটা বড় করুণ

তার নিশ্চয় কিছু করা দরকার
ফুলওয়ালীর
কিন্তু কিভাবে কি করবে সে জানে না
সে জানে না
কোথা থেকে শুরু করবে

এত জিনিষ করবার আছে
যখন ঐ লোকটা ম'রে যাচ্ছে
ঐ ফুলগুলো নষ্ট হচ্ছে
আব ঐ টাকা
ঐ টাকা গড়াচ্ছে
তার গড়ানো আব থামছে না।

অরুণ মিত্র

তোমাব জন্যে আমার প্রিয়া

আমি গেলাম পাখিব বাজাবে
কিনলাম পাখি
তোমার জন্যে
ও আমার প্রিয়া
আমি গেলাম ফুলের বাজারে
কিনলাম ফুল
তোমার জন্যে
ও আমার প্রিয়া
আমি গেলাম লোহার বাজারে
কিনলাম শিকল
ভারী ভারী শিকল
তোমার জন্যে
ও আমার প্রিয়া

তারপর আমি গেলাম বাঁদীর বাজারে
সেখানে তোমাকে খুঁজলাম
কিন্তু তোমাকে পেলাম না
ও আমার প্রিয়া।

অরুণ মিত্র

উদ্যান

হাজার হাজার বছরেও কুলোবে না
যদি বর্ণনা করতে যাই
চিরন্তন কালের সেই ছোট্ট মুহূর্তটা
যখন তুমি আমাকে চুমু খেলে
যখন আমি তোমাকে চুমু খেলাম
শীতের এক সকালের আলোয়
মঁসুরি পার্কের ভিতরে পারীতে
পারীতে
পৃথিবীর উপর
পৃথিবী যা এক নক্ষত্র।

অরুণ মিত্র

বেলায় ঘুম ভাঙলে

সাংঘাতিক
টিনের পাতমোড়া টেবিলের ওপর শক্ত ডিম ভাঙার
ছোট্ট আওয়াজটা
সাংঘাতিক সেই আওয়াজ
যখন তা ক্ষুধার্ত মানুষটার স্মৃতির মধ্যে নড়ে
ওটাও সাংঘাতিক মানুষের মাথাটা
ক্ষুধার্ত মানুষের মাথাটা

যখন সে সকাল ছ'টার সময়
বড় দোকানের আয়নায় নিজেকে দেখে
ধুলোরঙের একটা মাথা
কিন্তু নিজের মাথা সে দেখে না
পোর্ত্যার দোকানে জানলার কাচে
মানুষটার নিজের মাথা নিয়ে খোডাই পরোয়া
তার কথা সে ভাবে না
সে স্বপ্ন দেখে
কল্পনা করে আর একটা মাথা
যেমন একটা বাছুরের মাথা
একটু ঝোলের সঙ্গে
কিম্বা খাওয়া যায় এমন যে-কোনো একটা মাথা
এবং সে আস্তে আস্তে চোয়াল নাড়ায়
আস্তে আস্তে
আর দাঁত কড়মড় করে আস্তে আস্তে
কারণ দুনিয়া তাকে নিয়ে তামাশা করে
অথচ সে কিছুই করতে পারে না এই দুনিযার বিরুদ্ধে
সে তার আঙুলে গোনে এক দুই তিন
এক দুই তিন
তিন দিন তো হল সে কিছু খায় নি
তিন দিন ধরে সে বৃথাই বলছে
এরকম চলতে পারে না
কিন্তু চলে
তিন দিন
তিন রাত না খেয়ে
আর ঐ জানলার কাচের পেছনে
ঐ তৈরি মাংস ঐ বোতল ঐ আচার
মরা মাছ কৌটোর আশ্রয়ে
কৌটো কাচের আশ্রয়ে
কাচ পুলিসের আশ্রয়ে

পুলিস ভয়ের আশ্রয়ে
কত যে পাঁচিল ছয়টি হতভাগা পুঁটিমাছের জন্যে·
আর একটু দূরে কাফিখানা
কফিদুধ আর গরম টোস্ট
মানুষটা টলে
আর তার মাথার মধ্যে
কথার কুয়াশা
কথার কুয়াশা
খাবার জন্যে তৈরি পুঁটিমাছ
শক্ত ডিম কফিদুধ
কফি রাম-মেশানো
কফিদুধ
কফিদুধ
কফিখুন রক্ত-মেশানো।···
পাড়ার খুব সম্মানিত একজন লোক
দিন দুপুরে খুন হয়েছেন
ভবঘুরে খুনীটা তাঁর কাছ থেকে লুট করেছে
দু'টো আধুলি
মানে একপাত্র রাম-দেওয়া কফি
শূন্য আধুলি সাত আনা
দুটো মাখন-মাখানো রুটি
আর বয়ের বকশিস দু'আনা।
সাংঘাতিক
টিনের পাতমোড়া টেবিলের ওপর ভাঙা
শক্ত ডিমের ছোট্ট আওয়াজটা
সাংঘাতিক সেই আওয়াজ
যখন তা স্মৃতির মধ্যে নড়ে
ক্ষুধার্ত মানুষটার।

অরুণ মিত্র

মনে হয় আছে
এক গোলাপ-বাগানে
একটিই গোলাপ
যার নাম ৺প্রেসিডেন্ট ডুমের্গ-এর সান্ত্বনাহীনা বিধবা
বড়ই করুণ
বড়ই শোচনীয়
আছে
বরং বলা যায়
ছিল
একটি লোক যে লিখে গেছে এই কথাগুলো পর পর
আগামীকাল আমাদের কবরের উপর ফসল হবে
আরো সুন্দর
বড়ই করুণ
বড়ই শোচনীয়
কারণ এমন নয় মোটেই
যে ফসল জন্মাবেই
যারা প্রাণ হারায় তাদের কবরের উপরে
যাতে ওঠানামা করে
ফসলের দর
এমনকি মগজের কয়লার বা ফুলের দর
তবুও ব্যাঙ্কের ভয়ঙ্কর নোটের উপর
অধিকারীদের নিদারুণ নোটের উপর ঝলকায়
মাননীয় চিত্রকরদের আঁকা
মূঢ় রঙীন ছবি রঙ পাকা
শ্রমের জ্বালা-ধরানো মূর্তি
তাতে দেখা যায় মজুরের ফুর্তি
সযত্নে রূপ দেওয়া
তার ঠোঁটে হাসি হাতে যন্ত্রপাতি

ঘাস্থ্যে কাটো-কাটো বুকের ছাতি
গ্রীষ্মের মনোরম ক্ষেতে
সে ফসল কাটে গানে মেতে
কিন্তু কখনো দেখা যায় না
বাস্তবের আয়না
ঘামে-নাওয়া মজুর ফসলের মতো কাটা মজুর ক্ষেতে
বড়ই করুণ
বড়ই শোচনীয়
শস্তের শীষ বাঁধা হ'য়ে গেছে সারি সারি
মজুরও
বড় বড় নোট দিয়ে বড় বড় অধিকারী
ঠাট্টা জুড়ে কিনেছে তার মাথা
এবং তার গোটা শরীরটার উপর
তাদের অধিকার জারী
আর তার সব বছরের সব কাজের উপর
সব শীষ বাঁধা হ'য়ে গেছে সারি সারি
প্রত্যেক শস্তের কণা গোনা
প্রত্যেক ভঙ্গি টুকে-নেওয়া
প্রত্যেক ফুল ছিঁড়ে-তোলা
ফসল ওঠানামা করে
সেই সঙ্গে টাকা
সেই সঙ্গে চিনি
সেই সঙ্গে ইস্পাত
আর মজুরের হিসেবনিকেশ
মুনাফার মজুরীতে বেশ
বিজ্ঞভাবে মেলানো
যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে
সন্ত চাষ-লাগানো
মাটির উপর
নিজেদের তৈরি শহরের ধ্বংসের ভিতর

যারা ছিল সবচেয়ে জোয়ান
সবচেয়ে জীবন্ত
সবচেয়ে হাসিখুশি
হৃদয়ে সবচেয়ে সুন্দর
তারা নিশ্চল শুয়ে আছে সম্মানক্ষেত্রের উপর
মৃত্যুর মুখে মাখা আর
বন্দুকে ফুল
তাদের সরল জীবনের স্মরণীয় ফুল
তারও পালা আস্তে আস্তে পচবার
প্রিয়াদের ফুল বন্ধুদের ফুল যার যার
এবং এই সম্মানের ক্ষেত্রের উপর
সম্মানের এবং মুনাফার
ক্ষেত্রের উপর একটু পরে এই সযত্নে সমান করা
সম্মান-ক্ষেত্রের উপর থাকবার
একক
কৃত্রিম ফুল অসার
অবাস্তব গোলাপ
বমি পায় এমন ফুল
চেঁচাতে ইচ্ছে করে এমন ফুল
অমুক প্রেসিডেন্টের বিধবা সান্ত্বনা নেই যাঁর
ক্যাকাসে গোলাপী ফুলকপি জবরদস্তি জোড়-লাগানো
জঘন্য উদ্ভিদ হাস্যকর ভাঁড়ানো
আর একবার
গায়ের জোরে
সামরিক সঙ্গীতযোগে সাড়ম্বরে
দেওয়া হল গুঁজে আটকে হল ঝোলানো
পৃথিবীর পোশাকের কোকরে
যে-পৃথিবী ওষ্ঠাগত-প্রাণও
যে-পৃথিবী নির্জন চরাচরে
যে-পৃথিবী লুণ্ঠিত থিক্কৃত গোঙানো

নৈরাশ্যের ভারে নোয়ানো
বাহারে পোশাকে সাজানো।

অরুণ মিত্র

সংসারে

ঘরে একলা মা। ঘরে ঢোকে ছেলে ; অল্পবয়স, ফ্যাকাসে, অস্থির, চুল এলোমেলো। ঢুকেই সে দেয়ালে লুটিয়ে পড়ে।

ছেলে

এক্ষুনি দরজা বন্ধ কর, মা, পায়ে পড়ি তোমার !

মা মাথা নেড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে দরজা বন্ধ করল।

মা

(দরজায় তালা দিতে দিতে, ছেলের মতই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে)

তালা·· এই দেওয়া হল ! (ছেলের দিকে ভালো করে তাকিয়ে) দেখুন, ঠিক ঝড়ের মতন ও ঢুকল আর চেঁচাতে শুরু করল, আবার কেমন কাঁপছে দেখুন।

ছেলে

মাগো, তুমি যদি জানতে···

মা

আমি জানি না তবে কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে···(মিষ্টি হেসে) আবার নিশ্চয় কিছু একটা বদমাইসি করে এলি !

ছেলে

মাগো !

মা

কেন এই অস্থিরতা, কেন এই উদ্বিগ্ন দৃষ্টি, কি লুকিয়ে রেখেছিস হাতের তলায় ?

ছেলে

আমার ভাই-এর মাথা, মা।

মা

(অবাক হয়ে) তোর ভাই-এর মাথা !

ছেলে

আমি ওকে খুন করেছি, মা!

মা

সত্যিই কি এর দরকার ছিল ?

ছেলে

(শোকার্তভাবে হাত নেড়ে) আমার চেয়ে ও বুদ্ধিমান ছিল।

মা

কিছু মনে করিস না। আমি তোকে সাধ্যমত ভালভাবে মানুষ করেছি। কিন্তু কি আর বলব, তোর বাবা, হায়, সেও তো খুব একটা চালাক ছিল না। (আবার মিষ্টি হেসে) যাক্ মাথাটা দে, আমি ওটাকে লুকিয়ে রাখি···(হেসে) পাড়া পড়শিরা যেন টের না পায়। হিংসার বশে অনেক ব্যাপারে তারা কটাক্ষ করতে পারে·· (মাথাটা নিরীক্ষণ করতে লাগল)।

ছেলে

(যন্ত্রণায় কাতর ভাবে) ওটা দেখো না, মা!

মা

(কঠিন অথচ কৌতুকের সঙ্গে) আমার বড় ছেলেব মাথা আমি যদি শেষবাবের মতো না দেখি, তাহলে তার চেয়ে অপূরণীয় ক্ষতি আর কি হতে পারে!··· (নরম সুরে) সত্যি, তোকেই আমি বেশি পছন্দ করি, তবু বাড়িয়ে না বললেও বলতে হয় "কর্তব্য করতে হবে।" (মাথাটা আবার দেখে) আর দেখুন শয়তান-টাকে। সে যে শুধু তাব ভাইকে খুন করেছে তাই নয়, তার চোখ দুটো বন্ধ করে দেওয়ার কষ্টটাও করে নি! (নিজেই বন্ধ করে) আঃ এই ছেলেগুলো (হেসে) আমি যদি না থাকতাম! (ভেবে) মনে হয় ভাঁড়ার ঘরের সব-চেয়ে বড় পাথরটার পেছনে···

ছেলে

(উদ্বেগের সঙ্গে) ভাঁড়ার ঘরে, তোমার কি সত্যিই ভয় হয় না যে···সত্যিই···

মা

(অভিভূত না হয়ে) ভয়ের কিছুই নেই : আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে তোর বাবাকে খুন করে ঐখানেই আমি তার মাথাটা লুকিয়ে রেখেছিলাম।

ছেলে

!!!

মা

হুঁ, তখন আমার বয়স অল্প, প্রেমে পাগল ; হেসে বেড়াতাম, নেচে বেড়াতাম …(সে হাসল) হায়রে যৌবন, উন্মাদনা, অবাস্তবতা। (বেরিয়ে যেতে যেতে) এক্ষুণি আসছি…তুই খাবার টেবিল সাজা।

ছেলে

আচ্ছা মা।

মা

(চৌকাঠ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে) আর ধড়টা ? ধড়টাকে নিয়ে কি করলি ?

ছেলে

(একটু ইতস্তত করে) ধড়টা ? ওটা এখনও ছুটে বেড়াচ্ছে…

মা

হায়রে যৌবন। সবাই একই রকম…সবাই বাইরে ছুটে চলেছে, তিড়িং তিড়িং করে নেচে চলেছে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে…

মা বেরিয়ে যায়। ছেলে একাকী ঘরে খাবার টেবিল সাজাতে থাকে। হঠাৎ দরজায় টোকা।

ছেলে

???

আবার টোকা।

ছেলে

(উদ্বিগ্ন ভাবে) কে ? (কোনো উত্তর নেই, কিন্তু আবার টোকা) কে ওখানে ? (টোকা বেড়েই চলে কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া যায় না)।

কেউ একজন টোকা দিচ্ছে, জিগ্যেস করছি, অথচ কেউ উত্তর দিচ্ছে না… এক অমোঘ শক্তি আমাকে দরজার খিল খুলতে বাধ্য করছে…

সে এগিয়ে গিয়ে খিল খুলল আর ভয়ে পেছিয়ে এল। কারার প্রবেশ। মুণ্ডহীন এক যুবকের দেহ, সে অনেক ছুটেছে আর হাঁপাচ্ছে। ছেলে কিছু বলে না, কিন্তু খুব বিরক্তভাবে তার ভাইয়ের দেহটা দেখতে থাকে, দেহটা স্পষ্টতই খুব বিহ্বলভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে।

ছেলে

বোস…(সে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল কিন্তু অন্য জন স্বভাবত তা দেখতে পেল না)। সত্যিই…(গভীর দীর্ঘশ্বাস)

মা

(দ্রুত, উৎফুল্লভাবে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে) যাক…সব ঠিক…(হঠাৎ তার

নজর পড়ল পায়চারি-করা মুণ্ডহীন ছেলের উপর)। আরে! এই তো তুই! সত্যিই তুই সুন্দর। (কথা বলতে বলতে সে টেবিলের উপর খাবারের প্লেট পাততে লাগল) এই রকম অবস্থায় কেলার বুদ্ধি কারও হয়! তার ওপর হাঁপাচ্ছে। হয়েছে…(সে স্নেহভরে তার হাত ধরল), আর স্যুপ খাবি আয়… (অপর ছেলেকে) আর তুইও, (স্নেহের সঙ্গে, সহৃদয়ভাবে) শোন, আশা করি তোরা আর ঝগড়া করবি না? যাক, হাতে হাত দিয়ে ভাব কর।

ছেলে

কিন্তু, মা!

মা

আমার কথা শুনছিস?

ছেলে

হ্যাঁ মা।

সে কোমলভাবে তার মুণ্ডহীন ভাইয়ের হাত ধরে এবং তা ঝাঁকাতে থাকে।

আমার ওপর রাগ করিস না…রাগের বশে আমি এ কাজ করেছি।…

মা

যাক, শেষ পর্যন্ত মিটমাট হল (ছেলেদের দিকে গভীর স্নেহের দৃষ্টি দিয়ে) কিন্তু এটাই সব নয়, তোর স্যুপ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে…

ছেলে

স্যুপ খেতে খেতে হঠাৎ থেমে গিয়ে, খিদে যেন মরে গেছে

কিন্তু মা!…(মুণ্ডহীন ভাইকে দেখিয়ে) ও তো খেতে পারবে না…(সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল) ওর স্যুপ!…

মা

(রেগে গিয়ে) বাকি ছিল এটাই। (তারপর সুন্দর হেসে) যা, ফানেল নিয়ে আয়…

ছেলে

ফানেল, মা?…

মা

হ্যাঁ, পাঁঠা কোথাকার…(সে স্যুপটা ছেলের মুণ্ডহীন ধড়ের "মাথার" ওপর ঢেলে দেবার মতন করে দেখাল।) হাজার হোক, এটা কোনো জাদু নয়…(কষ্টের সঙ্গে মাথা নাড়তে নাড়তে) সত্যিই, অনেক ধৈর্য ধরেছি, এমন

অনেক সময় আসে (আরও কষ্টের সঙ্গে মাথা নাড়তে নাড়তে) যখন প্রশ্ন জাগে যে, ভগবানের কাছে আমি এমন কি করেছি যাতে আমার এই রকম ছেলে হোল ?…

যবনিকা

গোলক গুঁই

দেশে ফেরা

ব্রিটানির একটা লোক বেশ কয়েকটা কেলেংকারি ক'রে
জন্মভূমিতে ফিরে আসে
দুয়ারুননে-র কারখানার সামনে সে ঘুরে বেড়ায়
কাউকে আর সে চিনতে পারে না
কেউ আর তাকে চিনতে পারে না
সে খুবই মনমরা হয়ে পড়ে।
ক্রেপ-পিঠের দোকানে সে ক্রেপ খেতে ঢোকে
কিন্তু সে খেতে পারে না
কি একটা ক্রেপগুলোকে তার গলায় আটকে রাখে
সে দাম মিটিয়ে দেয়
বেরিয়ে পড়ে
একটা সিগারেট ধরায়
কিন্তু সিগারেটটা খেতে পারে না।
কি একটা
কি একটা তার মাথার ভেতর
কিছু একটা খারাপ
ক্রমশ সে আরো মনমরা হয়ে পড়ে
আর হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় :
যখন সে ছোট ছিল কেউ একটা তাকে বলেছিল
'তোর জীবন শেষ হবে ফাঁসিকাঠে'

আর বছরের পর বছর
কখনো সে কিছুই করতে সাহস পায় নি
এমন কি রাস্তা পেরোতেও নয়
এমন কি সাগর পাড়ি দিতেও নয়
কিছুই নয় একেবারে কিছুই নয়।
তার মনে পড়ে যায়।
যে তাকে সব জানিয়ে দিয়েছিল সে হোল গ্রেজিয়ার খুড়ো
যে গ্রেজিয়ার খুড়ো সবার দুর্ভাগ্য ডেকে আনত
বদমাস !
আর ব্রিটানির লোকটা তার বোনেব কথা ভাবল
যে বোন ভোজিরার-এ কাজ করে
তার যুদ্ধে মারা যাওয়া ভাইয়ের কথা ভাবল
বিষণ্ণতা তাকে আঁকড়ে ধরে
যা কিছু সে দেখেছে
যা কিছু সে করেছে সবকিছুব কথা ভাবল
আরেকবার সে চেষ্টা করল
একটা সিগারেট ধরাতে
কিন্তু সিগারেট খেতে তার ইচ্ছে হোল না
তখন গ্রেজিয়ার খুড়োর সঙ্গে সে দেখা করবে স্থিব কবল
সে গেল
দরজা খুলল
খুড়ো তাকে চিনতে পারে না
কিন্তু সে ওকে চিনতে পারে
আর ওকে বলে :

'নমস্কার গ্রেজিয়ার খুড়ো'

আর তারপর সে খুড়োর ঘাড মটকায়।
আর দু-ডজন ক্রেপ
আর একটা সিগারেট খেয়ে
ক্যাঁপে-র ফাঁসিকাঠে সে জীবন শেষ করে।

শঙ্কব দাশগুপ্ত

মানুষ

মানুষগুলো
মানুষটি বলল
ওরা দৃঢ়পায়ে চলে আর আমিও ওদের সঙ্গে রয়েছি
তবু মানুষ এত দুর্বল
ঐ লোকটাকে দেখ
ও একটা জানলা খুলল
ও ঝুঁকে পড়ল
ও আবার জানলা বন্ধ করে দিল
ও বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল
ও বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ল না
আর ঐ আরেকজন লোক একজন ট্রাঙ্ক বন্ধ করল
ঐ ট্রাঙ্কে আছে কিছু একটা
বা বলা যায় কেউ একটা আছে যে বেঁচে ছিল
আবার ঐ যে লোকটা একটি মেয়ের হাত ধরে রাস্তা পার হচ্ছে
ওর দিকে তাকাও
মেয়েটির দিকে তাকাও
দেখ কি দ্রুতবেগে গাড়িটা যাচ্ছে
গাড়ি যাচ্ছিল দুর্ঘটনা ঘটল চিৎকার শোনা গেল
মেয়েটি মুহূর্তের জন্য শূন্যে উড়ল পরক্ষণেই পড়ে গেল
রক্তাক্ত উন্মুক্ত বিবস্ত্র চুরমার ওর দেহ
লোকটির দিকে তাকাও
ও যেন জমে গিয়েছে
নিস্পৃহ উদাসীন ও
ও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না
ও পালিয়ে গেছে অন্য কোথাও
আশ্রয় নিয়েছে
সম্পূর্ণ উদাসীন কয়েকটি মুহূর্ত
দুঃখকষ্টের হিসেব নেবার আগে কয়েকটি মুহূর্তের অবকাশ

তারপর নিজের চেতনায় ফিরে এসে ওমেয়েটির কাছে আসে, ও কাঁদে হাহাকার করে, ডাক্তার কোথায় বলে আর্তনাদ করে ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানায়
দুঃখের অনুভূতিকে ও লালন করে
ওর সঙ্গিনী রক্তের মধ্যে ভাসছে
আর ও নিজেকে বলছে
এখন আমার কি হবে

কিন্তু ওর বেদনাই ওকে সান্ত্বনা দেয় আর ওকে বলে
আমি যা তার চেয়ে আমাকে বড করে তুলো না
মৃদুকণ্ঠে ওকে আরো বলে
সত্যি করে বলতো তাকে কি তুমি এতই ভালবাসতে ?

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

আমেরিকার অভ্যন্তর

আন্তোনিয়ো বেকালকাতির জন্য
নিউ ইয়র্ক

নগরের ওপর দিয়ে সময় বয়ে যাচ্ছে—হঠাৎ যেন সময় থেমে যায়—এক চিত্রকরের ঘরে কয়েক মাসের জন্য থেমে থাকে।

হ্যাঁ, বেশ কিছুক্ষণের জন্য সময় থেমে যায়—চিত্রকরের সঙ্গী হয়ে থাকে।

আর এই চিত্রকর বাইরে যেতে পারে না—অথবা খুব কদাচিৎ হয়ত যায়।

তার নিজের কোন সময় নেই, তার সমস্ত সময় এখন কাটে এই ঘরটির দেয়ালে ছবি আঁকায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

অথচ এই ঘরটি, তা যে তলায় হোক না কেন, এটা বিদ্বজ্জনের ভাষায় এমন উচ্চস্থান নয় যেখানে শুধুই বুদ্ধির খেলা চলে, আবার এ মিমি প্যাসোঁর থাকার মত বা ব্ল্যাকসিরিজের ওপর তলার কুঠুরি নয়, আবার গ্রীনউইচ ভিলেজের সুন্দর সাজানো ওপরের ঘরও নয়—সোজা কথায় নির্মম সত্যের ভাষায় বলতে গেলে এ এমনই একটি ঘর যার স্বস্তিদায়ক উগ্র সাধারণত্বের সঙ্গে চিত্রকরের বোঝাপড়া করতে হবে। এই ঘরের চার দেয়াল তার চারদিকে

দাঁড়িয়ে আছে, চিন্তিত সচেতন বিদ্রোহী লোকের মাথার চুল যেমন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ; এই চার দেয়ালের প্রত্যেকের সত্য আলাদা, এই চারটি সত্য কথা না বলে সে এ ঘর থেকে বেরোতে পারবে না।

চিত্রকর ঘরের ভেতরে থাকে, জানলাগুলো—বা জানলাটি, ঘরে যদি একটিই জানলা থাকে—না খুলে।

বাইরে—সে চেনে।

কি লাভ আবিষ্কার করে—অবনত সূর্যের আলোয় আর ধুলোয় জর্জরিত মরচে ধরা তামার মতন সবুজ রঙের এই একটুকরো জমি, এই নগরের দীপ্ত আলোগুলি যা কলরবে মলিন হয়ে মুছে গিয়েছে।

রাত্রির অসহ্য মধুর জীর্ণ সঙ্কটের কথাও সে জানে—যখন সব রাস্তা হয়ে যায় কানা গলি, যেখানে প্রতিকারহীন দুঃখের মুখোশপরা কোন নেশাখোর তার নেশাভঙ্গের অস্থিরতার আক্রোশের ছুরি তোমার গলার নিচে বা পিস্তল পেটের ওপর ধরে—"দয়া করতেই হবে, পছন্দ না হলেও দয়া করতেই হবে, নয়ত আমার এই তৈরি করা স্বপ্ন কুকুরের চেয়েও হীনভাবে মরে যাবে।"

চিত্রকর যার নাম আন্তোনিয়ো রেকালকাতি, কেননা সে ইতালিতে জন্মেছিল, অন্য দেশের শ্রান্তি ও অবসাদের মালমশলায় গড়া বাড়ি ও ঘরগুলোর কথাও জানে, সে জানে আজকের দিনে সমস্ত জগত পৃথিবীকে তিন ভাগে বিভক্ত ক'রে দেখে, পৃথিবী থেকে যে মুখ লুকিয়ে আছে, রক্তের মুখ, হত্যার মুখ, যুদ্ধ ও হানাহানির মুখ।

আর সে যদি টেলিভিসনের বিজ্ঞাপনের ঘোষণাগুলি শোনে—"কাল আপনি হবেন কোকা—কাল আপনি হবেন কোলা", সে বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে বলে, "কাল আপনি হবেন নেপাম", এই বলে সে সুইচ ঘুরিয়ে দেয়।

কিন্তু যখন সে চিত্রের মধ্যে দিয়ে ভিয়েৎনামের কথা ফুটিয়ে তোলে, সে কখনও অন্যদের মতন তার ছবির ক্যানভাসকে মলোটোভ ককটেল বলে ভুল করে না বা তার ইজেলকে ব্যারিকেড মনে করে না। আর যখন সে নিজস্ব সত্তার বিরুদ্ধে—অর্থাৎ যে সত্তাকে লোকে বলবে "সে", আর সে নিজে বলবে "এই আমি"—তীব্র হিংসা ও ঘৃণায় ভরা ঔদাসীন্যের সঙ্গে জীবনের ধ্বংসের চিত্র আঁকে, তখন সে নিজের সঙ্গে এই গোপনে কথা বলাবলিতে সানন্দে বাধা দেয়। চিত্রিত সেই ঘরে আসবাবপত্রে বসবার চেয়ার ডিভান সবকিছুতেই একটি সুন্দর যুবকের সমস্যায় পীড়িত হয়ে উদ্বেগের বিচারকের কাছে নিজের

দোষের স্বীকারোক্তির পরিচয় আর পাওয়া যায় না, শুধু পাওয়া যায় উজ্জ্বল দিবালোকে বা স্তব্ধ মধ্যরাতে দেহে দেহে, আত্মায় আত্মায়, রক্তের কণায় কণায় প্রেমের মিলনের চিত্র। চিত্রকলায় বা যে কোনো ভাষায় প্রেমের পরিচয় প্রেম, প্রেমের উত্তর প্রেম।

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

পিকাসোর ম্যাজিক লণ্ঠন

একটি নারীর সবকটা চোখ একই ছবিতে চঞ্চল
নোংরা রঙচঙে কাগজের একটা স্থির ফুলের তলায় ভাগ্যতাড়িত প্রিয়জনের
    আদল
চেয়ারের অরণ্যে খুনের সাদা ঘাস
শ্বেতপাথরের একটা টেবিলের ওপর এফোঁড় ওফোঁড়এক পিচবোর্ডের ভিখিরি
একটা স্টেশনের প্ল্যাটফরমের ওপর একটা চুরুটের ছাই
একটা প্রতিকৃতির প্রতিকৃতি
একটা শিশুর গোপন রহস্য
রান্নাঘরের সিন্ধুকের অনস্বীকার্য দীপ্তি
হাওয়ায় একটুকরো ন্যাকড়ার তাৎক্ষণিক সৌন্দর্য
পাখির চাউনিতে ফাঁদের উন্মাদ আতঙ্ক
সেলাই ফেঁসে যাওয়া একটা ঘোড়ার কিম্ভূত হ্রেষা
ঘণ্টা-বাঁধা গচ্চরগুলির অসম্ভাব্য সংগীত
টুপির মুকুট পরানো নিহত ষাঁড
ঘুমন্ত লালচুল একটি মেয়ের তুলনাবিহীন পা আর তার এতটুকু চিন্তার
    এই বড় কান
[illegible]
নৈস্কর লবণের একটা কণার বিপুল পাথরের মূর্তি

প্রতিটি দিনের আনন্দ আর মরে যাওয়ার অনিশ্চয়তা আর মৃদুহাসির ক্ষতস্থানে
ভালোবাসার বর্ণাফলক
সবচেয়ে নগণ্য কুকুরটির সবচেয়ে দূরবর্তী নক্ষত্র
আর জানলার কাচে রুটির কোমল স্বাদ নোনতা
হারিয়ে যাওয়া আর ফের খুঁজে পাওয়া আর ভেঙে টুকরো টুকরো হওয়া
আর ফের গড়ে তোলা প্রয়োজনের নীল ছেঁড়া পোষাকে সাজানো ভাগ্যরেখা
চালের পিঠের ওপর একটা মালাগার কিসমিসের অবাক করা আবির্ভাব
খুপরির মধ্যে একটা লোক লাল মদের ঘায়ে দেশের যন্ত্রণাকে কাবু করে দিচ্ছে
একগোছা মোমবাতির চোখ ধাঁধানো আলো
ঝিনুকের মতো হাঁ-করা সমুদ্রমুখো একটা জানলা
ঘোড়ার খুর আর একটা বড ছাতার খালি পা
খুব ঠাণ্ডা এক বাড়ির ভেতর নিঃসঙ্গ একটা ঘুঘুর অতুলনীয় লাবণ্য
ঘড়ির মৃত ওজন আর তার হাবানো মুহূর্তেরা
স্বপ্নচাবী সূয যে মাঝরাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন আর হঠাৎ চোগ ধাঁধিয়ে যাওয়া সৌন্দর্যকে
আচমকা জাগিয়ে দেয় তার কাঁধে চিমনির ওভারকোট চাপায় আর সাঁটা
কাগজের পোষাক আব হিস্পানি সাদার মুখোস লাগানো ধোঁয়ার
অন্ধকারের মধ্যে সঙ্গে করে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যায়
এবং আরো অনেক কিছু
শিল্পের শৈশবকে দোল খাওয়াতে থাকা সবুজ কাঠের একটা গীটার
পোটলাপুটলি সমেত একটা রেলের টিকিট
হাতটা সেই মুখকে বিভ্রান্ত করে যে মুখ একটা প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে
একদৃষ্টিতে তাকিয়ে
আশ্চর্য স্মিতমুখ উৎফুল্ল আর বেহায়া আনকোরা আর নগ্ন
একটি মেয়ের আদুরে কাঠবেড়ালি
বোতল রাখার গোপখোপ বাক্স কিংবা বাদ্যযন্ত্রের খোপ থেকে জননেন্দ্রিয়ের
আকার এবং বারংবার গজানো আর সবুজ উদ্ভিদের বর্মের মতো হঠাৎ
অলক্ষ্যে বেরিয়ে আসা
মেয়েটিও হঠাৎ অলক্ষ্যে শাস্ত্রসম্মত বিধুর আর হাড জিরজিরে বুড়ো প্রাচীন
শিল্পদ্রব্যের মতো সুন্দর একটা তালগাছের পচে যাওয়া গুঁড়ি থেকে
বেরিয়ে আসা

ভোরের ফুটির আকার ঘন্টাগুলো একটি সান্ধ্য-পত্রিকার চিৎকারে চুরমার
একটা ঝুড়ির তলা থেকে বেরিয়ে-আসা কাঁকড়ার ভয়ংকর দাঁড়াগুলো
শাস্তি পাওয়া আসামীর ছুফোঁটা অশ্রু নিয়ে একটি গাছের শেষ ফুল
আর ঈর্ষার গাঢ় লাল ডিভানের ওপর নিঃসঙ্গ আর প্রথম স্বামীদের বিবর্ণ ভীতি
দ্বারা পরিত্যক্ত দারুণ সুন্দরী বধূ
আর তারপর শীতের এক বাগানে সিংহাসনের পিঠের ওপর অস্থির একটা
মেনীবেড়াল আর এক রাজার নাকের ফুটোর নিচে তার লেজের গোঁফ
বেতের ঝুড়ির কাছে বসা এক বুড়ির পাথুরে মুখে দৃষ্টির পাথুরে চুন
আর বাতিঘরের রেলিঙে সবে লাগানো রেড অক্সাইডের ওপর ঘুরে বেড়ানো
ভাঁড়ের ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে যাওয়া নীল হাতগুলি সমুদ্রের দিকে তার দৃষ্টি আর
তার বিরাট ঘোড়াগুলো অস্তগামী সূর্যালোকে ঘুমন্ত আর তারপর তারা
জেগে ওঠে তাদের নাসাবন্ধ্র ফেনায়িত তাদের ফসফরাসের দ্যুতিময় চোখ
বাতিঘরের দীপ্তিতে এবং তার ভয়ংকর ঘূর্ণায়মান আলোয় ব্যাকুল
একজন ভিখিরির মুখের ভেতর পুরো ঝলসানো একটা বাবুই
পার্কের মধ্যে পাগল এক পঙ্গু যুবতী ছেঁড়া ছেঁড়া যান্ত্রিক হাসি হাসতে হাসতে
কোলে একটা ঘুমে অসাড় বাচ্চাকে দোল খাওয়াতে খাওয়াতে তার
নোংরা খালি পা দিয়ে ধুলোর মধ্যে বাপের আদল আর তার হারিয়ে
যাওয়া চেহারা আঁকে আর ছেঁড়া কাপড়ে জড়ানো নবজাতককে পথচারী-
দের দেখায় দেখো আমার খোকামণিকে দেখো আমার খুকুমণিকে আমার
সাতরাজার ধন মানিককে আমার নিজের বাচ্চাটিকে একদিকে ও ছেলে
অন্যদিকে ও মেয়ে প্রতিদিন ভোরে ছেলেটা কাঁদে প্রতিদিন সন্ধ্যায়
মেয়েটাকে শাস্ত করি আর ঘড়ির মত ওদের দম দিই
আর এছাড়া গোধূলি দেখে মুগ্ধ বাগানের দারওয়ান
একটা ঊর্ণায় ঝুলে থাকা একটা মাকড়সার জীবন
ভাঙা দোলকওয়ালা একটা পুতুলের অনিদ্রা আর চিরকালের জন্য খোলা তার
বড় বড় কাচের চোখ
একটা সাদা ঘোড়ার মৃত্যু একটা চড়ুইয়ের যৌবন
পোঁ-দ-লোদী সড়কে একটা স্কুলের দরজা
আর যার নামে তাদের নাম সেই ছোট্ট রাস্তার একটা বাড়ির লোহার
রেলিঙে মহান অগাস্টিনরা বিদ্ধ

একটি মাত্র মাছকে ঘিরে ধীবরের সমস্ত জেলেরা
একটা ডিমের প্রচণ্ডতা আর একটা সৈনিকের কষ্ট
পাপোষের তলায় লুকিয়ে রাখা একটা চাবির ভুলতে না পারা অস্তিত্ব
আর ভীষণ মোটা একটা মানব-প্রতিমের দৃপ্ত এবং সুডোল হাতে ধ্বজচিহ্ন
আর মৃত্যুর রেখা আর যুদ্ধের সম্মান ও বিভীষিকার সংগ্রহশালার বিরাট
মৃত্যুময় ঝুলবারান্দার ওপর চোখে পড়ার মত নিশান এবং জমকালোভাবে
পতাকার মত উত্তোলিত স্বস্তিকাকার ক্রুসিফিক্সগুলির পেছনে সতর্কভাবে
আড়াল করা এবং প্রলাপ বকতে থাকা খাটো দুটি-পা আর লম্বা উর্ধ্বাঙ্গ
নিয়ে জীবন্ত হাস্যকর মূর্তি অথচ মহানায়কের মৃদুহাসিটুকু সত্ত্বেও তার
বিবর্ণ এবং লালচে-হলুদ মাংসের মুখোসের ওপর রাতের প্রস্রাবাগারের
সব দেয়ালে হতভাগা নতুন যুগের নিপীড়নকারীদের লেখা অশ্লীল লিপির
মত খোদিত ভয় অবসাদ ঘৃণা আর নির্বুদ্ধিতার অনিবার্য এবং শোচনীয়
ছাপ লুকোতে অসমর্থ
আর তার পেছনে একটুখানি ফাঁক করা কূটনৈতিক ডাকের থলির শবাগারে
চাঁদির নিখুঁত লোকগুলোর স্বর্ণপিণ্ডের আঘাতে ক্ষেতের মধ্যে হঠাৎ
আক্রান্ত এক চাষীর মৃতদেহ
আর পাশেই টেবিলের ওপর পেটের মধ্যে গোটা একটা সহর নিয়ে হাঁ-করা
গ্রেনেড
আর গুঁড়িয়ে দেওয়া আর রক্ত শুষে নেওয়া ঐ সহরের ব্যথা
একটা স্ট্রেচার ঘিরে ঘোড়সওয়ার সমস্ত রক্ষীবাহিনীর লম্ফঝম্ফ
সেখানে একটা মৃত জিপসি এখনো স্বপ্ন দেখে
আর প্রেমিক কর্মঠ নিশ্চিন্ত এবং চমৎকার এক মানবগোষ্ঠীর সমস্ত রাগ হঠাৎ
চোখের সামনে জবাই করা একটা মোরগের রক্তিম আর্তনাদের মতো
ফেটে পড়ে
আর নিম্নবেতনের মানুষের সৌর সর্ণালী যা শ্রমিক-সদনের রক্তাক্ত নাড়িভুঁড়ি
থেকে রক্তাক্ত উদ্গত হয় হাতের ডগায় ধরা কষ্টের মলিন দীপ্তি গের্নিকার
রক্তাক্ত প্রদীপ আর তার রূঢ় এবং বাস্তব আলোর দারুণ উজ্জ্বলতায়
আবিষ্কার করে ব্যবহারে ব্যবহারে জীর্ণ মজ্জা অবধি ফাঁপা রঙচটা একটা
জগতের বীভৎস নকল রঙগুলি
যে জগৎটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মারা গেল

যে জগৎ দণ্ডিত
আর ইতিমধ্যে বিস্মৃত
জনস্রোতে প্রবাহিত জলের হাজার আগুনে ডুবে যাওয়া অঙ্গার হয়ে যাওয়া
যেখানে গণরক্ত ছুটে চলে অশ্রান্তভাবে
অনিবার্যভাবে
পৃথিবীর ধমনিতে ধমনিতে আর শিরায় শিরায় আর তার সত্যিকারের সন্তান-
দের ধমনিতে ধমনিতে আর শিরায় শিরায়
আর শুধু একটুকরো সাদা কাগজে আঁকা তার যে কোন সন্তানের মুখ
আঁদ্রে ব্রতোঁর মুখ পল এলুয়ারের মুখ
রাস্তায় চোখে পড়া কোন ঠেলাওয়ালার মুখ
প্রিমরোজ-ওয়ালার চোখের ইশারার আভা
চেস্টনাটফলের ভাস্করের বিকশিত হাসি
আর একটা ইস্ত্রির পাশে দাঁড়ানো একজন প্লাস্টারের মেষপালকের হাতে
প্লাস্টারের মধ্যে খোদাই করা কোচকানো একটা সত্যিকারের ব্যা ব্যা করা
প্লাস্টারের ভেড়া
একটা খালি চুরুটের বাক্সের পাশে
ভুলে ফেলে যাওয়া একটা পেন্সিলের পাশে
ওভিদের মেটামরফসিসের পাশে
একটা জুতোর ফিতের পাশে
অনেক বছরের ক্লান্তিতে পা-কাটা একটা আরামকেদারার পাশে
দরজার একটা কলিংবেলের পাশে
একটা স্টিললাইফের পাশে যাতে একটা ঠিকে ঝির শিশুসুলভ স্বপ্নগুলি জলন্ত
নুড়ির ওপর হাঁপধরা মরোমরো মাছগুলির মতো একটা বেসিনের ঠাণ্ডা
পাথরের ওপর মুমূর্ষু
আর নিরাশ সেই ঠিকেঝির মরা মাছের আর্তনাদে বাড়িটা আগাগোড়া
আন্দোলিত হঠাৎ যে ঝি নৌকাডুবিতে পড়ে সেন নদীর ঢেউয়ের আঘাতে
ঊর্ধ্বে উত্তোলিত আর ভের-গালাঁর বাগানে করুণভাবে সেনের কূলে
আছড়ে পড়তে যাচ্ছে
আর সেখানে হতবুদ্ধি ঝিটা একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে
আর সে তার হিসেব নিকেশ করে

আর নিজেকে তার পুরনো দিনের স্মৃতিতে পচে গলে সাদা আর গন্ধের মতো
ছিন্নমূল বলে মনে হয় না
একটিমাত্র ঘর তার রয়েছে একটা শোবার ঘর
আর কিছুটা সময় পাওয়ার জন্য ওটাকে নিয়ে যেই সে হেড টেল করতে যাবে
তেকোণা আয়নার মধ্যে ভীষণ ঝড় সুরু হয়
সঙ্গে বেঁচে থাকার আনন্দের সবকটি শিখা
জৈব উত্তাপের সবকটি বিদ্যুৎ-চমক
খোশ মেজাজের সবটা আভা
আর বিপর্যস্ত বাড়িটাকে চূড়ান্ত ঘা দিয়ে
শোবার ঘরের পর্দাগুলো জ্বালিয়ে দেয়
আর চাদরগুলোকে বিছানার পায়ের দিকে আগুনের গোলার আকারে গড়িয়ে
দিয়ে
স্মিত হেসে সমস্ত জগতেব সামনে উন্মোচিত কবে
সবকটি টুকরো সমেত প্রেমের ধাঁধা
তার সবকটি বাছাই করা টুকরো পিকাসোর বাছাই করা
একজন প্রেমিক তার প্রেমিকা আর ওর দুপা তার কাঁধে
তার দৃষ্টি পাছায় আর হাত প্রায় সর্বত্র
পায়ের পাতা দুটো আকাশের দিকে তোলা আর উথাল পাথাল স্তন
দুটি শরীর আলিঙ্গনবদ্ধ পাল্টাপাল্টি করা সোহাগ কবা
ছিন্নমুণ্ড মুক্ত আর উৎফুল্ল ভালোবাসা
পরিত্যক্ত মাথা গালিচার ওপর গড়াতে থাকা
ফেলে দেওয়া ভুলে যাওয়া হারিয়ে যাওয়া ভাবনাগুলি
আনন্দ আর সুখের দ্বারা ক্ষতি করার ক্ষমতা লোপ করে দেওয়া
রাগত ভাবনাগুলি রাগরঞ্জিত ভালোবাসার দ্বারা হতবুদ্ধি
মাটিতে ফেলে দেওয়া আর মাটিতে ঢাকা ভাবনাগুলি ভালোবাসার প্রচণ্ড
জাহাজডুবি আসছে বুঝে মৃত্যুর হতভাগ্য ইঁদুরগুলির মত
ঘরের দরজায় রুটির পাশে জুতোর পাশে স্বস্থানে পুনঃস্থাপিত ভাবনাগুলি
পুড়ে খাক করা লাফিয়ে পার হওয়া বিলুপ্ত করে দেওয়া আদর্শলুপ্ত ভাবনাগুলি
অনুরক্ত এক জগতের আশ্চর্য উদাসীনতার সামনে প্রস্তরীভূত ভাবনাগুলি
যে জগৎ ফের খুঁজে পাওয়া

যে জগৎ অনস্বীকার্য আর অব্যাখ্যাত
যে জগৎ শিষ্টাচারশূন্য অথচ বাঁচার আনন্দে পূর্ণ
যে জগৎ সংযমী আর মাতাল
যে জগৎ বিষণ্ণ আর আনন্দিত
কোমল আর হিংস্র
বাস্তব আর পরাবাস্তব
ভয়ংকর আর মজাদার
রাত্রিকালীন আর দিবাকালীন
স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক
দারুণ সুন্দর

১৯৪৪

পুষ্কর দাশগুপ্ত



যন্ত্রণা, বিস্ফোরণ, নীরবতা

কালার্ভর জাঁতাকল। দু'বছর ধরে গঙ্গাফড়িঙের খামার, বাবুইয়ের কেল্লা। এখানে সব কিছুই কথা বলত স্রোতে, কখনো হাসি দিয়ে, কখনো যৌবনের মুঠি দিয়ে। আজ সে প্রাচীন বিদ্রোহী জীর্ণ হয়ে পড়ছে তার পাথরগুলোর মধ্যে, যারা বেশিরভাগই হিমে, নিঃসঙ্গতায়, উত্তাপে মৃত। আর ভবিষ্যতের আভাসগুলো ফুলের নিঃশব্দতায় ঝিমিয়ে পড়েছে।

রঝে বেরনার: দানবদের দিগন্ত তার বাসভূমির অত্যন্ত নিকটে ছিল।

পাহাড়ের মধ্যে খুঁজো না; কিন্তু যদি সেখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অপ্‌দেং-এর গিরিবর্ত্মে পড়ুয়ার মুখওয়ালা কোন বজ্রের সাক্ষাৎ পাও তাহলে তার কাছে এগিয়ে যেও, হ্যাঁ, তার কাছে এগিয়ে যেও, তার দিকে তাকিয়ে হেসো কারণ সে নিশ্চয় ক্ষুধায় জর্জর, বন্ধুত্বের ক্ষুধায়।

অরুণ মিত্র

বলো

বলো আগুন যা বলতে দ্বিধা করে
বায়ুমণ্ডলের সূর্য, সাহসী আলো,
এবং মরো সবার জন্যে তা বলেছ ব'লে।

অরুণ মিত্র

বাতাসকে বিদায়

গ্রামের টিলার গায়ে মিমোজা ভরা মাঠগুলো রাত কাটায়। ফুল তোলার মরশুমে তাদের জায়গা থেকে দূরে এক মেয়ের সঙ্গে অতি সুগন্ধ সাক্ষাৎ ঘ'টে গেল, এমন হয়। সে-মেয়ের হাতদুটো সারাদিন ভঙ্গুর শাখাপ্রশাখায় ব্যাপৃত ছিল। সুরভি যার জ্যোতির্বলয় এমন এক প্রদীপের মতো সে অস্তগামী সূর্যের দিকে পিঠ ক'রে চ'লে যায়।

তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে পবিত্রতাকে অপমান করা হবে।

পাদুকায় ঘাস মাড়াতে মাড়াতে তার পথ ছেড়ে দিয়ো। হয়তো সৌভাগ্যক্রমে দেখতে পাবে তার ওষ্ঠে রাত্রির আর্দ্রতার মৃগতৃষা

অরুণ মিত্র

ওদের আবার দাও

ওদের মধ্যে যা আর বর্তমান নেই তা আবার ওদের দাও,
ওরা আবার দেখবে ফসলের দানা মঞ্জরীর ভিতরে বন্ধ হচ্ছে
এবং ঘাসের উপর নড়াচড়া করছে।
পতন থেকে উৎসার পর্যন্ত ওদের মুখের বারো মাস ওদের শেখাও,
ওরা ওদের হৃদয়ের শূন্যতাকে লালন করবে আগামী বাসনা পর্যন্ত;
কেননা কোনো কিছুরই ভরাডুবি ঘটে না, কোনো কিছুই ভস্মের
জন্যে উন্মুখ হয় না;
এবং যে দেখতে জানে কেমন ক'রে মাটির পরিণতি হয় ফলে,
সর্বস্বান্ত হ'য়েও কখনো সে বিচলিত হয় না।

অরুণ মিত্র

ছুটি

গোলাপগাছ, কেন তুমি তোমার দুই গোলাপ নিয়ে
দীর্ঘ বারিধারায় দুলে দুলে ভাব ঠিক রাখো?
দুটি পাকা বোলতার মতো তারা না উড়ে ব'সে থাকে।
আমি তাদের দেখি আমার হৃদয় দিয়ে, কেননা আমার চোখ বন্ধ
ফুল ছাড়িয়ে উপরে আমার ভালোবাসা রেখে গেছে
শুধু হাওয়া আর মেঘ।

অরুণ মিত্র

চৌকাঠ

দৈবের আত্মসমর্পণের বিরাট ফাটলটার হু-হু শোষণে যখন কেঁপে উঠল মানুষের বাঁধ, তখন যে-শব্দগুলি দূরে-দূরে ছিল ও যারা হারাতে চায়নি, তারা রুখে দাঁড়ালো সেই প্রবল ধাক্কা সামলাতে। সেখানে নিরূপিত হল তাদের অর্থের বংশক্রম।

আমি ছুটলাম মহাপ্লাবনী এই রাত্রির শেষ পর্যন্ত। এখন হে আমার বন্ধুগণ যারা আসছ, আমি অপেক্ষা করছি তোমাদের, কম্পমান প্রত্যূষে প্রোথিত হয়ে, আমার কটিবন্ধ ভরে ঋতুর দল। আন্দাজও পাচ্ছি তোমাদের, ইতিমধ্যেই, মসীমাখা দিগন্তের ওপার থেকে। তোমাদের গৃহের শুভকামনায় আমাব চুল্লীতে আঁচ সমানই থাকছে। এবং তোমাদেরই জন্য এই প্রাণ খুলে হাসে আমার দেওদাবেব যষ্টি।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

এক দুঃখে আমার বাস

শরতের জ্ঞাতি ঐ স্নেহগুলির হাতে ছেড়ে দিও না তোমার হৃদয়ের চালনার ভার, যে-শরতেরই ধীরসুস্থ গতি ও শিষ্টাচাবী মনঃক্লেশ ওরা ধার করেছে। চোখ ঢুলুঢুলু হয় সহজেই। যন্ত্রণা চেনে কম শব্দ। শোও বরং বোঝা ছাডা : স্বপ্ন দেখবে আগামীকালেব এবং হালকা ঠেকবে শয্যা তোমার। স্বপ্ন দেখবে, তোমার গৃহের জানালায আর কাচ নেই। বাতাসের সঙ্গে মিলতে চেয়ে তুমি অধীব, যে-বাতাস একটি বছব পেরোয় এক রাত্রিতে। সুরেল সংমিশ্রণের গান ধরবে অন্যেরা, সেই মাংসেরা যাতে মূর্ত আজ মাত্র বালুকা-ঘড়ির মোহিনীশক্তিই। বারবার যা কৃতজ্ঞ করায়, তার নিন্দা তুমি করবে। পরে, লোকে তোমায সনাক্ত করবে চূর্ণ-বিচূর্ণ কোনো সেই দৈত্য বলে, যে অসম্ভবের অধীশ্বর।

তবু।

তোমার রাত্রির ভারই শুধু বাডালে। ফিরলে তুমি প্রাচীরে মাছ ধবতে, ফিরলে বছরের এমন তপ্ততম দিনে যা গ্রীষ্মহীন। যে-মনের মিলটা নিজেই পাগল হতে চলেছে, তার মাঝখানে পড়ে তোমাব প্রেমের বিরুদ্ধে তুমি খাপ্পা।

ভাবো এমন নিখুঁত বাড়ির কথা যার ভিত উঠতে নিজে কখনো দেখবে না। কবে হবে পাতালের ফসল তোলার দিন? কিন্তু তুমি সিংহের চোখ দুটো গেলে দিলে। কৃষ্ণ ল্যাভেণ্ডারের উপর দিয়ে সৌন্দর্যকে চলে যেতে দেখছ বলে ভাবছ…

আবার কে তোমায় ঠেলে তুলল,আরো একটু উপরে, এবং তবু ঘুচল না তোমার সন্দেহ?

পবিত্র আসন কোথাও নেই।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

উদ্ভাবকেরা

ওরা এল, আরেক উৎরাই থেকে বনবক্ষীবা, আমাদেব অপরিচিত, আমাদের আচার-আচরণের বিরোধী।

ওরা এল অগণন।

পুনবায় জলসিক্ত এবং সবুজ পুরনো ফসলেব খেত

আর দেবদারু গাছগুলির সীমারেখায় ওদের দলকে দেখা গেল।

দীর্ঘ পদযাত্রা ওদের উত্তপ্ত করে তুলেছিল।

ওদের টুপিগুলো চোখের ওপর এলিয়ে পড়েছিল আর ওদের শ্রান্ত পা পড়ছিল এলোপাথাড়ি।

•

আমাদের দেখতে পেয়ে ওবা থামল।

বোঝা যায ওরা ভাবতে পারে নি ওখানে আমাদের দেখতে পাবে,

অনায়াস ভূমি আর ঘন-সংবদ্ধ হলরেখার ওপর,

দর্শকদেব প্রতি একেবারে ভ্রূক্ষেপহীন।

আমরা মাথা তুলে ওদের উৎসাহ দিলাম।

সবচেয়ে বাক্‌পটু লোকটা কাছে এগিয়ে এল, তারপর ঠিক তেমনি ছিন্নমূল আর মন্থরগতি দ্বিতীয় একজন

তোমাদের চিরশত্রু, ঘূর্ণিঝড়ের আসন্ন আবির্ভাবের সংবাদ তোমাদের জানাতে আমরা এসেছি, বলল ওরা।

পিতৃপুরুষের বচন আর নানান বিবরণ ছাড়া আর কোনভাবেই তাকে
আমরা তোমাদের চেয়ে ভালোভাবে চিনি না।
তবু তোমাদের সামনে কেন যে আমরা অবোধ্যভাবে উল্লসিত আর সহসা
শিশুদের মত ?

আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে ওদের বিদায় দিলাম।
তবে তার আগে, ওরা মদ খেল, আর ওদের হাত কাঁপতে লাগল, আর ওদের
চোখ গেলাসের কানায় হাসতে থাকল।
কুঠার আর গাছের মানুষগুলি, কোনো একটা আতংকের মুখোমুখি হতে
সক্ষম, কিন্তু জলস্রোতকে বইয়ে নিয়ে যেতে, ঘরবাড়ির সারি গড়ে
তুলতে কি তাতে মনভোলানো রঙের আস্তর লাগাতে অপারগ।
শীতের বাগান আর আনন্দের সঞ্চয় ওদের অজ্ঞাত।

অবশ্যই আমরা ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে বশ করতে পারতাম।
কেননা ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা মর্মস্পর্শী।
হ্যাঁ, শীঘ্রই ঘূর্ণিঝড় আসছিল,
তবে তা নিয়ে কথা বলে ভবিষ্যতকে উপদ্রুত করার কি তেমন একটা দরকার
ছিল ?
যেখানে আমাদের বসতি, সেখানে জরুরী ভয় বলে কিছুই নেই।

পুষ্কর দাশগুপ্ত

কবির

নিরক্ষরের বেদনা বোতলের অন্ধকারে
শকট-নির্মাতার অলক্ষ্য অস্বস্তি
তামার পয়সা গভীর পাত্রে

লোহার পাতের ডোঙায়
জীবন কাটায় নিঃসঙ্গ কবি
বাদার প্রকাণ্ড একচাকা ঠেলাগাড়ি

পুষ্কর দাশগুপ্ত

ঐ কামানের মুখ থেকে তুষারপাত। আমাদের মাথার মধ্যে ছিল নরক। একই মুহূর্তে আমাদের আঙুলের ডগায় বসন্তকাল। পুনরনুমোদিত পদরেখা, অনুরক্ত পৃথিবী, উচ্ছ্বসিত তৃণদল।

সব কিছুর মত অস্তবও কেঁপে উঠল।

ঈগল ভবিষ্যতের গর্ভে।

আত্মার অজ্ঞাতেই যে তাকে প্রবর্তনা দেয় এমন প্রতিটি কর্মের উপসংহার হিসেবে থাকে কোন এক অনুতাপ কি বেদনা। তাকে মেনে নিতে হবে।

কি করে আমার কাছে লেখা এলো? শীতে, আমার জানলার কাচে একটি পালকের মতো। অমনি ধরেব অগ্নিকুণ্ডে বেগে যায় জলন্ত কাঠগুলোর লড়াই, যা, এখন পর্যন্ত, সাঙ্গ হয় নি।

আমাদের অভিনিবেশে সাড়া দেওয়া বিদ্যুচ্চমকের তলায়, সহরের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া, শুধু আমাদেরই পায়ে পায়ে চিহ্নিত পথ নিয়ে আটপৌরে চাউনির কোমল সহরগুলি।

যা আমরা আগে থেকে ভাবি নি, যা আমরা স্পষ্ট করি না, একান্ত নিজস্ব পদ্ধতিতে যা আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে আলাপ করবে এমন কিছু একটা ঘটলে আমাদের ভেতরে সবকিছুই কেবল এক আনন্দময় উৎসবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি লাভ করবে।

এসো গভীরতা মাপার রজ্জু ফেলে যাই, শব্দের সংহতিতে একই পর্দায় কথা বলে চলি, শেষ পর্যন্ত আমরা স্তব্ধ করে দেবো ঐ কুকুরগুলিকে, এমন করতে পারবো যাতে আমাদের দিকে ধোঁয়াটে এক-চোখের দৃষ্টি রেখে তারা তৃণভূমির সঙ্গে একাকার হয়ে যাবে, যখন হাওয়া মুছে দেবে তাদের পিঠ।

বিদ্যুচ্চমক আমার মধ্যে অব্যাহত।

শুধু রয়েছে আমার সধর্মী সঙ্গিনী বা সঙ্গী, যে আমায় জড়তা থেকে জাগিয়ে তুলতে পারে, করতে পারে কবিতার উন্মোচন, আমায় ছোটাতে পারে পুরনো মরুভূমির সীমারেখাগুলির বিরুদ্ধে, যাতে আমি সেগুলি জয় করতে পারি। আর কেউ নয়। স্বর্গ কিংবা বিশেষ অধিকার পাওয়া মর্ত্য, অথবা আলোড়নকারী কিছুও নয়।

মশাল, আমি আমার সধর্মী ছাড়া আর কারো সঙ্গে নাচি না।

জগৎ আর নিজের সম্পর্কে একটুখানি ভ্রান্তি ছাড়া, প্রথম শব্দগুলি সম্পর্কে একটুকরো অজ্ঞতা ছাড়া কোন কবিতা সুরু করা যায় না।

কবিতায়, প্রতিটি কি প্রায় প্রতিটি শব্দকে তার আদি অর্থে ব্যবহৃত হতে হবে। বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন কোনটি হয়ে ওঠে বহুযোজী। কোন কোনটি স্মৃতিভ্রষ্ট। প্রসারিত অনন্ত হীরক-খণ্ডের মণ্ডলী।

কবিতা আমার কাছ থেকে আমার মৃত্যুকে ছিনিয়ে নেবে।

কেনইবা বিচূর্ণ কবিতা? কারণ দেশের অগ্নিমুখে যাত্রার শেষে জন্মপূর্ব অন্ধকার আর পার্থিব কঠোরতার পর, কবিতার সমাপ্তিই আলোক, জীবনের কাছে জীবের অবদান।

কবি যা আবিষ্কার করে তাকে সে নিজের অধিকারে রেখে দেয় না, লিপিবদ্ধ করে তাকে অবিলম্বে হারিয়ে ফেলে। ওরই মধ্যে নিহিত থাকে তার নতুনত্ব, তার অন্তহীনতা আর তার সংকট।

সূচীমুখ আমার বৃত্তি।

জন্ম হয় মানুষের সঙ্গে, দেবতাদের মধ্যে ঘটে সান্ত্বনাহীন মৃত্যু।

যে মাটি বীজ ধারণ করে তা বিমর্ষ। এত যার বিপদের সম্ভাবনা সেই বীজ উৎফুল্ল।

এমন এক অভিশাপ যার কোন তুলনা মেলে না। এক ধরনের আলস্যে

সে চোখ পিটপিট করে, মনোরম তার স্বভাব, মুখভঙ্গি আশাপ্রদ। অথচ ভানটা কেটে গেলে, কী যে উদ্দীপনা, লক্ষ্যের অভিমুখে কী যে অব্যবহিত গতি। যে ছায়ায় সে ভারা বাঁধে তা অশুভ, একান্ত গোপন প্রদেশ, তাই হয়ত কোন এক আহ্বান থেকে সে অব্যাহতি পাবে, নিত্যই সরে পড়বে যথাসময়ে। কয়েকজন দ্রষ্টার আকাশের অবগুণ্ঠনের মধ্যে যথেষ্ট ভীতিপ্রদ কিছু অধিবৃত্ত সে রচনা করে।

নিস্পন্দ গ্রন্থবাজি। অথচ যেসব গ্রন্থ আমাদের দিনগুলির অভ্যন্তরে অনায়াসে প্রবিষ্ট হয়ে পড়ে, সেখানে আর্তনাদ করে ওঠে, সুরু করে নৃত্যোৎসব।

কি করে ব্যক্ত করা যায় আমার স্বাধীনতা, আমার বিস্ময়, হাজার বাঁকের শেষে: সেখানে নেই কোন ভিৎ, নেই কোন ছাদ।

বারংবার একটি অশ্বশাবকের, দূরবর্তী কোন এক শিশুর ছায়ামূর্তি গুপ্তচরের মত আমার কপালের দিকে এগিয়ে আসে আর লাফিয়ে ডিঙোয় আমার দুশ্চিন্তার বাধা। তখন গাছের তলায় ঝর্ণা আবার কথা বলতে থাকে।

যে নারীরা আমাদের ভালবাসে তাদের ঔৎসুক্যের কাছে আমরা অপরিচিত থাকতে চাই। আমরা তাদের ভালোবাসি।

আলোর একটা বয়স আছে। অন্ধকারের তা নেই। তবে কখন ছিল এই অখণ্ড উৎসের লগ্ন?

জ্বলন্ত আর যেনবা তুষারে ঢাকা কয়েকটি মৃত্যু চাই না। মজবুত একটি হলেই হোল। আর পুনরুত্থানহীন।

পিছু হটার উপায় এতটুকু বা একেবারেই না থাকা সত্ত্বেও যারা নিজেদের সঙ্গতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, এসো আমরা সেইসব প্রাণীর কাছে দাঁড়াই। প্রতীক্ষা ওদের ভেতরে ভেতরে এক মাথাঘোরানো অনিদ্রা খুঁড়তে থাকে। সৌন্দর্য ওদের পরিয়ে দেয় এক ফুলের টুপি।

পাখিরা, তোমরা যারা তোমাদের ভণিমা, তোমাদের বিপজ্জনক সুরুপ্তি সমর্পণ কর এক শরবনে, শীতের প্রাদুর্ভাবে আমরা কেমন তোমাদের মত হয়ে যাই।

আমি ভালোবাসি যেসব হাত ভরে ওঠে, আর, যুগনদ্ধ হওয়ার জন্য, মিলিত হওয়ার জন্য যে আঙুল অঙ্ককে প্রত্যাখ্যান করে।

বারবার আমার মনে হয় যে, আমাদের অস্তিত্বের প্রবাহকে ধারণ করা দুঃসাধ্য, যদিও শুধুমাত্র তার খেয়ালী ক্ষমতার ফলভাগী আমরা নই, তবু হাত আর পায়ের অনায়াস গতি আমাদের নিয়ে যেতে পারবে সেই আকাঙ্ক্ষিত তটভূমিতে, যেখানে যেতে আমাদের ভালো লাগবে, বহুতর প্রণয়ের সন্নিধানে, যাদের বিভিন্নতা আমাদের সমৃদ্ধ করে তুলবে, ঐ গতি অসমাপ্ত থেকে যায়, দ্রুত অবসিত হয় চিত্রাকারে, আমাদের চিন্তার ওপর সুগন্ধির একটি বড়ির মত।

আকাঙ্ক্ষা, যে আকাঙ্ক্ষা জানে, পায়ে পায়ে বেরিয়ে এসে যারা আমাদের দীপ্তিময় করে তোলে সে সব অলক্ষ্য শৃঙ্খল, অলক্ষ্য অগ্নিশিখার যথার্থ সংমিশ্রণ কিছু স্বীকার ছাড়া আমাদের অন্ধকার থেকে আর কিছুই আমরা পাই না।

সৌন্দর্য একাকী তার মহিমান্বিত শয্যা রচনা করে, অদ্ভুতভাবে তার খ্যাতি গড়ে তোলে মানুষের মধ্যে, তাদেরই পাশে অথচ একান্তে।

এসো আমাদের অন্তরের ক্ষতগুলির ধারে, পাহাড়ে পাহাড়ে বপন করি শরবন, গড়ে তুলি আঙুর খেত। নিষ্ঠুর আঙুল, সতর্ক হাত, এই রঙ্গময় ক্ষেত্রই হলো উপযুক্ত।

আবিষ্কার যে করে তার বিপরীতে যে উদ্ভাবন করে এক লৌহমণ্ড, মাঝামাঝি কিছু একটা, কতিপয় মুখোস ছাড়া আর কিছুই সে বস্তুতালিকায় যোগ করে না, আর কিছুই এনে দেয় না প্রাণীদের কাছে।

অবশেষে সমগ্র জীবন, যখন তোমার গভীরে ভালোবাসার সত্য থেকে ছিনিয়ে নিই মাধুর্য।

মেঘের কাছাকাছি থাকো। সজাগ থাকো যন্ত্রের কাছে। প্রতিটি বীজ ঘৃণিত।

মানুষের হিতকারিতা কোন কোন তীব্র ভোর। প্রলাপী হাওয়ার জটলায়, আমি উর্ধ্বগতি, বন্দী করি নিজেকে, অভুক্ত কীট, অনুসৃত এবং অনুসারী।

কঠিন আকৃতি, ঐ জলরাশির মুখোমুখি, যে পথ ধবে চলে যায় ফেটে প'ড়া তোড়ায় সবুজ পর্বতের তাবৎ ফুল, প্রহরগুলি দেবতাদের পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

সতেজ সূর্য, আমি যার বল্লরী

পুষ্কর দাশগুপ্ত



লেওপল দ সেদার সঁগরের কবিতা

POEMES DE LEOPOLD SEDAR SENGHOR

জিন-এর রাত্রি

বধূ, আমার কপালের ওপর রাখো তোমার বেদনা দূর করা হাত, পশমের চেয়ে
কোমল তোমার হাত।

ওপরে আন্দোলিত তালগাছগুলি রাতের প্রবল মলয় বাতাসে যারা মর্মর ধ্বনি
তুলছে

কচিৎ। ধাইমা-দের গান পর্যন্ত নেই।

ছন্দোময় স্তব্ধতা আমাদের দোলা দিক।

এসো তার গীত শুনি, এসো শুনি আমাদের নিবিড় রক্তের স্পন্দন,
এসো শুনি

হারিয়ে যাওয়া গ্রামগুলির কুয়াশার ভেতর আফ্রিকার নাড়ীর
গভীর স্পন্দন।

ঐ যে নিথর সমুদ্রের শয্যায় ঢলে পড়ছে শ্রান্ত চাঁদ

ঐ যে ঝিমিয়ে পড়ছে ফেটে পড়া হাসি, কথকরা নিজেও

ঢুলছে মায়ের পিঠে বাচ্চার মত

ঐ যে নাচিয়েদের পা ভারী হয়ে আসছে, ভারী হয়ে আসছে চাপান উৎরান
গাওয়া দুই দল গায়কের জিভ।

এইতো সময় নক্ষত্রের আর রাত্রির, যে রাত্রি ভাবছে

কনুইয়ে ঠেস দিয়ে আছে ঐ মেঘের পাহাড়ে, পরনে দুধসাদা দীর্ঘ কটিবাস,

কুঁড়েঘরগুলির চাল কোমল আলোয় চিক্‌চিক্ করছে, কি এমন গোপনীয় কথা
ওরা বলছে, তারাদের ?

ভেতরে ঝাঁঝালো আর মদির গন্ধের অন্তরঙ্গতার মধ্যে ঘরের অগ্নিকুণ্ড নিভে
যায়।

বধূ, জ্বালিয়ে দাও ঘিয়ের প্রদীপ, পিতৃপুরুষেরা কথা বলুক, বাচ্চারা শুয়ে
পড়লে বাবা-মা যেমন বলে।

এক্সো এলিসার প্রাচীনদের কণ্ঠস্বর শুনি। নির্বাসিত আমাদের মতো
ওরা মরতে চায় নি, চায নি ওদের বীর্যের খরস্রোত বালুকার মধ্যে পথ
হারিয়ে ফেলুক।
যেন আমি কান পাতি, ধোঁয়ায় ভরা কুঁড়েঘরের ভেতর যেখানে শুভ আত্মাদের
ছায়ার আনাগোনা
তোমার উষ্ণ স্তনের ওপর আমার মাথা আগুন থেকে বের হওয়া আর ধোঁয়া
বেরোতে থাকা একটা দণ্ড্-এর মতো
আমি যেন আমাদের মৃতদের গন্ধ নিশ্বাসে টেনে নিতে পারি যেন তাদের
জীবন্ত কণ্ঠস্বর সংগ্রহ করতে আর পুনরায় আবৃত্তি করতে পারি,
যেন ডুবুরিকে ছাড়িয়ে ঘুমের দূর অতলে নেমে যাওয়ার আগে, বাঁচতে শিখি।

পুষ্কর দাশগুপ্ত

কৃষ্ণা নারী

নগ্ন নারী, কৃষ্ণা নারী
সেজেছ তোমার জীবন্ত গায়ের রঙে, তোমার দেহ-প্রতিমার সৌন্দর্যে!
তোমার ছায়ায় আমি বেড়ে উঠেছি, তোমার হাতের কোমলতা ঢেকে দিয়েছে
আমার চোখ
আর ছাখো গ্রীষ্মের আর মধ্যাহ্নের হৃদয়ে আমি তোমাকে খুঁজে পাই,
প্রত্যাশার স্বপ্নভূমি, ওপর থেকে আরো ওপরে তাপদগ্ধ গ্রীবা
এবং তোমার সৌন্দর্য আমার হৃদয়ে নিয়ে আসে বজ্রের দাহন, যেন
ঈগলের বিদ্যুৎচমক।

নগ্ন নারী, ছায়াছন্ন নারী
নিটোল শাঁস ভর্তি পাকা ফল, কালো মদের তামস উল্লাস, মুখ যা আমার
মুখকে গীতিময় করে তোলে
তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর অকলংক যার দিগন্তগুলি, তৃণভূমি কেঁপে ওঠে পূবালী
বাতাসের উষ্ণ আলিঙ্গনে
খোদিত টমটম, টানটান টমটম গমগম করে ওঠে বিজয়ীর হাতের আঙুলে

নগ্ন নারী, ছায়াচ্ছন্ন নারী
তেল—কোন ফুৎকারে যা কুঞ্চিত হয় না স্থির তেল—মল্লের বক্ষে,
মালি-রাজপুত্রের বক্ষে
আকাশী দড়িতে বাঁধা পড়া হরিণ, তোমার ত্বকের তমসায়
মুক্তোগুলি নক্ষত্র
আত্মার আনন্দের তৃপ্তি, রক্তাভ সোনার প্রতিবিম্ব তোমার ত্বকে ঢেউ
খেলে যায়
তোমার কেশপাশের ছায়ায়, আমার উদ্বেগ ঝলসে ওঠে তোমার চোখের
আগামী সূর্যগুলির কাছে।

নগ্ন নারী কৃষ্ণা নারী
জীবনের শিকড়গুলিকে পুষ্ট করবার জন্য হিংসুকে অদৃষ্ট তোমাকে ছাই করে
দেবার আগে
তোমার অস্থির সৌন্দর্যের আমি গান গাই চিরন্তনতায় প্রতিষ্ঠা করি
তোমার দেহপ্রতিমা।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

নবীন সূর্যের অভিবাদন

নবীন সূর্যের অভিবাদন
আমার বিছানার উপরে, তোমার চিঠির আলো
প্রভাতের ছড়িয়ে পড়া সব শব্দ
শ্যামাপাখির তীক্ষ্ণ ডাক, গনলেকের ঘণ্টাগুলি
ঘাসের উপরে, আশ্চর্য শিশিরবিন্দুর উপরে তোমার হাসি।

নিষ্পাপ আলোয়, হাজার হাজার গঙ্গাফড়িং
পতঙ্গগুলি, যেন কালো ডানা বিশাল সোনালি মৌমাছি
আর যেন লাবণ্য ও কমনীয়তার বাঁকগুলিতে হেলিকপ্টার
প্রসন্ন সমুদ্রবেলায়, সোনালি আর কালো ঝাউগাছগুলি
আমি আবৃত্তি করি মালি-রাজকন্যাদের নাচের সংগীত।

দ্যাখো আমি তোমার খোঁজে, বনবিড়ালের পায়ে পায়ে।
তোমার সুগন্ধ চিরদিন তোমারই সুগন্ধ, গুঞ্জরণময় বনে বাদাড়ে
উদ্ধত লাইলাকের গন্ধের চেয়ে তীব্র।
তোমার মদিব বক্ষ আমাকে পথ দেখায, আফ্রিকাব তৈরি তোমাব সুরভি
যখন আমার বাথালিয়া পায়েব তলায় আমি মাড়িয়ে চলি বুনো পুদিনা।
পরীক্ষা আর সময়ের অন্তে, গহ্বরেব তলায়
হায় ভগবান! তোমাকে যেন ফিবে পাই, ফিরে পাই তোমার কণ্ঠ
তোমার কম্পিত আলোর সুবাস।